রবীন্দ্র রচনাবলী

দ্বাবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

প্রান্তিক

প্রান্তিক

১

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে ; জীবনের দিগন্ত-আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে, দিল ধৌত করি
ব্যথার দ্রাবক রসে, দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে—
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায় সেইমত জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে— অন্তঃশীলা
জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরিব্যবধানসম, আজ দেখিলাম

প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত। বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে

শান্তিনিকেতন
২৫।৯।৩৭

২

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্তের প্রান্তপথ
দীপ্ত ক'রে দিক, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্বসমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচলচূড়ে
অরুণকিরণতলে একদিন অমর্ত প্রভাতে।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৩

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে
মেলিনু নয়ন; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,

লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৪

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারালো প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায়— ক্ষয়ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদিমূল্য তার।
চতুষ্পথে দাঁড়াল সে ললাটে পণ্যের ছাপ নিয়ে
আপনারে বিকাইতে— অঙ্কিত হতেছে তার স্থান
পথে-চলা সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়।
হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে
আরতিশঙ্খের ধ্বনি যে লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,
মনে হল, মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশাপ্রত্যাশার কোলাহল। মনে হল,
পরের মুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্ন-মোছা
অসজ্জিত আদিকৌলীন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীতমন্দিরে
একাকীর একতারা হাতে। আদিমসৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিময় তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্‌ণ বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যু স্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।

বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথিপারে
পূর্ব ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয়হুংকারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙা পরম বিস্ময়ে
শুকতারানিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে।

শান্তিনিকেতন
১।১০।৩৭

৫

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরস্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৬

মুক্তি এই— সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, উর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎপ্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত-উৎসারিত।
সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনা-গ্রাসী বিরাট ধুলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে। অনিঃশেষ যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহ মন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ওই নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরসসম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে

বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি' চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি-ঘোষণার আগে।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৭

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে স্বরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। নানা রন্ধ্রে প্রাণের ফোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের নানা বেদনায়।
এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাত্রির শিশিরজলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহস্পর্শনে— তবু আজো
আছে তারা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে,
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্যগন্ধে বিজড়িত।
কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী
রসে পূর্ণ করিয়াছে থরে থরে মনের বাতাস,
প্রভাত-আকাশ যথা চেনা-অচেনার বহু সুরে
কূজনে গুঞ্জনে ভরা। অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অম্লান

আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাই নি যা বহু সাধনায়—
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। কল্পনায়
বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে,
বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে, আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টিরহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্‌বারিত
আমার জীবনরচনায়, তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণক্ষণে
অপরূপ অনির্বচনীয়। আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

শান্তিনিকেতন
৭।১০।৩৭

৮

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি-মুছে-যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে। এতকাল
যে সাজে রচিয়াছিনু আপনার নাট্যপরিচয়
প্রথম উঠিতে যবনিকা, সেই সাজ মুহূর্তেই
হল নিরর্থক। চিহ্নিত করিয়াছিনু আপনারে
নানা চিহ্নে, নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে,
মুছিল তা, আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা
আমারে করিল স্তব্ধ, সূর্যাস্তের অন্তিম সংকারে

দিনান্তের শূন্যতায় ধরার বিচিত্র চিত্রলেখা
যখন প্রচ্ছন্ন হয়, বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে।

শান্তিনিকেতন
৯।১০।৩৭

৯

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের ’পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১০

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব ;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার ; দেখি নি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি ; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া। সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির-সীমান্ত-জ্যোতির্লোকে, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১১

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি,
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হয়ে এল ; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে এসে।

আকাশের আঙিনায় শান্ত যেথা পাখির কাকলি
সুরসভা হতে সেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার
বাষ্পে-বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—
কেহ শুধাবে না নাম, অধিকারগর্ব নিয়ে তার
ঈর্ষা রহিবে না কারো, অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১২

শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি, প্রদোষের
নির্মলতিমিরতলে। ভৃতি তব সেবার শ্রমের
সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে ;
এক প্রহরের মূল্য আরেক প্রহরে ফিরে নিতে
কুণ্ঠা কভু নাহি তার ; বাহির-দ্বারের যে দক্ষিণা
অন্তরে নিয়ো না টেনে ; এ মুদ্রার স্বর্ণলেপটুকু
দিনে দিনে হাতে হাতে ক্ষয় হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে,
উঠিবে কলঙ্করেখা ফুটি। ফল যদি ফলায়েছ বনে,
মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাঙ্গ হল
ফুল ফোটাবার ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হয়ে যাক

লোকমুখবচনের নিশ্বাসপবনে দোল খাওয়া।
পুরস্কারপ্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে ; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে ; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।
যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
সে যে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত,
নবজাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১৩

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে ; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

শান্তিনিকেতন
১৯।১২।৩৭

১৪

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধুলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র-জীর্ণপুষ্প-সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনীপ্রভাতে
অস্তসিন্ধুপরপারে। কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে; কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর;
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর স্বর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধুলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম— সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩৪১

১৫

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে লুটায়ে
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে উড়ে যাব রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধুলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ
১৩৪২

শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল—
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

১৬

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে-কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে,
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে,
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ বৈশাখ ১৩৪১

১৭

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রুরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার

দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল— সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

শান্তিনিকেতন
২৫।১২।৩৭

১৮

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

শান্তিনিকেতন
খ্রীস্ট-জন্মদিন
২৫।১২।৩৭

সেঁজুতি

উৎসর্গ

ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার

বন্ধুবরেষু

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে চেতনা সারারাতি
সুখদুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নবপ্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে।
আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি—
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১ শ্রাবণ ১৩৪৫

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি,
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো; অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে— যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্যপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ন রবে সগৌরবে ; তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী ;
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে ; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে

মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশিরকণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলিসূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্বদেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী —
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হত জড়যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হত নিঃশ্বসিত, আজি মর্তের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে

মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

বৃথা বাক্য থাক্‌। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষপ্রহরের ঘণ্টা ; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।

জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা— বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

গৌরীপুর-ভবন। কালিম্পং
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

পত্রোত্তর

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত

বন্ধু,

চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক্ রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্রললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গণদ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা ;
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা—
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।

আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা ;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত স্বর,
নিজ অর্থ না জানে ;
ধূলিময় বাধা-বন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
'দেখেছি দেখেছি' এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে ;
ধন্য যে আমি, সে কথা জানাই কারে—
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি ;
পরুষকলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনোকিছু
কে তাহা বলিতে পারে—
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে ;
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা ;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথি।

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।
জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই ;
সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

মংপু। দার্জিলিং
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

যাবার মুখে

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,

স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
প্রবঞ্চনায়-ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়।
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয়, তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিনহাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।
রাজা মহারাজ মিলায় শূন্যে ধুলার নিশান তুলে,
তারা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
যাওয়ায় আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি করে।

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ওই চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল, ওই-যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূরজনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরই ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাতরবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি—
'যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি'।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

যায় যদি তবে যাক
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন, যাক।

শান্তিনিকেতন
২২ মাঘ ১৩৪৩

অমর্ত

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা। –
ওইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্খিনে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুলশাখায় সাধা,
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি ;
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখনা তুলি।
দায়-ভোলা মোর মন
মন্দে-ভালোয় সাদায়-কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ
ছাড়িয়ে গেছে দূর দিগন্ত-পানে
আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার ;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,

পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

শান্তিনিকেতন
১১।৩।৩৭

পলায়নী

যে পলায়নের অসীম তরণী
বাহিছে সূর্যতারা
সেই পলায়নে দিবসরজনী
ছুটেছে গঙ্গাধারা।
চিরধাবমান নিখিলবিশ্ব
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে।
জলের ছায়া সে দ্রুততালে বয়,
কঠিন ছায়া সে ওই লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে।

সৃষ্টি যখন আছিল নবীন
নবীনতা নিয়ে এলে,
ছেলেমানুষির স্রোতে নিশিদিন
চল অকারণ খেলে।
লীলাছলে তুমি চিরপথহারা,
বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা,
তোমার কূলেতে সীমা দিয়ে কারা
বাঁধন গড়িছে মিছে।

আবাঁধা ছন্দে হেসে যাও সরি
পাথরের মুঠি শিথিলিত করি,
বাঁধাছন্দের নগরনগরী
ধুলায় মিলায় পিছে।

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে,
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।
ভিত ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল,
তারা বুঝিল না— অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।
বিজয়তোরণ গাঁথে তারা যত
আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত,
খেলা করে কাল বালকের মতো
লয়ে তার ভাঙা ঢেলা।

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে।
কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর
নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
নাই বা মিলিল কোনো।
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো।

এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
দুঃখই তাহে মেলে।
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
তাই নাও, দাও ফেলে।
যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
আলোক আঁধার বহি।
দাঁড়াবে না কিছু তব আহ্বানে,
ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা-পানে,
ভেসে যদি যাও যাবে একখানে
সকলের সাথে রহি।

শান্তিনিকেতন
১৯ চৈত্র ১৩৪৩

স্মরণ

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে,
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে,
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।

ওদের এনেছে ডেকে আদিসমীরণে
ইতিহাসলিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে,
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।
সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি,
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন;
চারি দিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন,
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার;
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই;
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।

সেদিনের হারা আমি— চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বান-পাতি
যেখানে কালের সীমারেখা নেই—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।
দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালো মন্দের কোনো জঞ্জাল;
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।

সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই ;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা — এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩৪৩

সন্ধ্যা

চলেছিল সারাপ্রহর
আমায় নিয়ে দূরে
যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকো
অনেক ঘাটে ঘুরে।
দূর কেবলই বেড়ে ওঠে
সামনে যতই চাই,
অন্ত যে তার নাই।
দূর ছড়িয়ে রইল দিকে দিকে,
আকাশ থেকে দূর চেয়ে রয় নির্নিমিখে।
দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে
যাত্রাপথের সুর,
অনেক দূর-যে অনেক অনেক দূর।
ওগো সন্ধ্যা শেষপ্রহরের মেয়ে,
ভাসাও খেয়া ভাঁটার গঙ্গা বেয়ে।

পৌঁছিয়ে দাও কূলে
যেথায় আছ অতি-কাছের
দুয়ারখানি খুলে।
ঐ-যে তোমার সন্ধ্যাতারা
মনকে ছুঁয়ে আছে,
ছায়ায় ঢাকা আম্‌লকী-বন
এগিয়ে এল কাছে।

দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁদা—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
দিল অনেক বাধা।
নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানান দিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।
ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই।

শান্তিনিকেতন
২৩।৪।৩৭

ভাগীরথী

পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি
মর্তের ক্রন্দনবাণী ;
সঞ্জীবনীতপস্যায় ভগীরথ
উত্তরিল দুর্গম পর্বত,
নিয়ে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান—
ডাক দিল, আনো আনো প্রাণ—
নিবেদিল, হে চৈতন্যস্বরূপিণী তুমি,
গৈরিক অঞ্চল তব চুমি
তৃণে শষ্পে রোমাঞ্চিত হোক মরুতল,
ফলহীনে দাও ফল,
পুষ্পবন্ধ্যালতিকার ঘুচাও ব্যর্থতা,
নির্বাক্‌ ভূমির মুখে দাও কথা।
তুমি যে প্রাণের ছবি,
হে জাহ্নবী—
ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে
জাগ্রত কল্লোলে
গানে মুখরিয়া উঠে মাটির প্রাঙ্গণ,
দুই তীরে জেগে ওঠে বন ;
তট বেয়ে মাথা তোলে নগরনগরী
জীবনের আয়োজনে ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরি ভরি।

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়
নাহি জানে ;
তাই সে হেরিছে ধ্যানে,
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে
অক্ষয় অমৃতস্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।

পুণ্যতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।
সে ডাকিছে— মিথ্যাশঙ্কা-নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি সে তুমি মুছাও ;
গম্ভীর অভয়মূর্তি মরণের
তব কলধ্বনিমাঝে গান ঢেলে দিক তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে ;
নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব,
নিক সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব ;
শেষ দণ্ডে ভরে দিক তার কান
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য-অভিসার-গান।

শান্তিনিকেতন
২৬।৭।৩৭

তীর্থযাত্রিণী

তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে
শেষ আধক্রোশটুকু টেনে টেনে চলে কোনোমতে।
হাতে নামজপ-ঝুলি,
পাশে তার রয়েছে পুঁটুলি।
ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে—
আর কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আর কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্থেরে ফিরে পায়,
যেথা গিয়ে ছায়া
কোনো-এক রূপ ধরি পায় যেন কোনো-এক কায়া।
বুকের ভিতরে ওর পিছু হতে দেয় দোল
আশৈশব-পরিচিত দূর সংসারের কলরোল

প্রত্যাখ্যাত জীবনের প্রতিহত আশা
অজানার নিরুদ্দেশে প্রদোষে খুঁজিতে চলে বাসা।

যে পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন
সেখানে নবীন
আলোকে আকাশ ওর মুখ চেয়ে উঠেছিল হেসে।
সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।
যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে-সুখে-মেশা
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

আজিকে চলেছে যারা খেলার সঙ্গীর আশে
ওরে ঠেলে যায় পথপাশে ;
যে খুঁজিছে দুর্গমের সাথি
ও পারে না তার পথে জ্বালাইতে বাতি
জীর্ণ কম্পমান হাতে
দুর্যোগের রাতে।
একদিন যারা সবে এ পথনির্মাণে
লেগেছিল আপনার জীবনের দানে
ও ছিল তাদেরি মাঝে
নানা কাজে—
সে পথ উহার আজ নহে।
সেথা আজি কোন্ দূত কী বারতা বহে
কোন্ লক্ষ্য-পানে
নাহি জানে।

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

আলমোড়া
২২ মে ১৯৩৭

নতুন কাল

কোন্‌-সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

অনেক বাণীর বদল হল, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে-সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া
তারা ছিল আর-এক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্‌ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।
তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,
ইহকালের পরকালের হাজার-রকম ভয়।
জাগত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নামত দেশে,
ভাগ্যে লাগত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেষে।
ঘরের থেকে খিড়কিঘাটে চলতে হত ডর,
লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।
আঙিনাতে শুনত পালাগান,
বিনা দোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।
সামান্ত ছুতায়
ঘরের বিবাদ গ্রামের শত্রুতায়

গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।
হারত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চলত চাষ।
ধর্ম ছাড়া কারো নামে পাড়বে যে দোহাই
ছিল না সেই ঠাঁই।
ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কওয়া, সংকোচে মন ঘেরা,
গৃহস্থবউ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা—
আলতা পায়ে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
ঘরের কোণে জ্বালে মাটির দীপ।
মিনতি তার জলে স্থলে, দোহাই-পাড়া মন,
অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ।
আয়ুলাভের তরে
বলির পশুর রক্ত লাগায় শিশুর ললাট-'পরে।
রাত্রিদিবস সাবধানে তার চলা,
অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা।
ও দিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
এ দিকে সংসারের পথে অপদেব্‌তা নানা।
জানা কিম্বা না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
ভয়ে তারই হয় না মাথা সোজা।
এরই মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

সেদিনও সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁজ-সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনি,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাতকালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।

সন্ধেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,
হাঁস-বলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।
ডাঙায় উনুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে।
শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে।

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,
কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।
ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা,
বইবে নদীর ধারা—
জেলেডিঙি চিরকালের নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পান্‌সি রইবে বাঁধা।

তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

আলমোড়া
২৫ মে ১৯৩৭

চলতি ছবি

রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায় ওই-যে দূরের গ্রাম
যেমন ঝাপসা না-জানা ওর নাম।
পাশ দিয়ে যাই উড়িয়ে ধূলি, শুধু নিমেষ-তরে
চলতি ছবি পড়ে চোখের 'পরে।

দেখে গেলেম গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা ;
দেখে গেলেম পথের ধারে ব্যাবসা চালায় মুদি ;
দেখে গেলেম নতুন বধূ আধেক দুয়ার রুধি
ঘোমটা থেকে ফাঁক করে তার কালোচোখের কোণা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বট-গাছের তলায় পড়তি রোদের বেলায়
গ্রামের ক'জন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।
এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে।

ওই না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকালবেলায় পুবে
সূর্য ওঠে, সন্ধেবেলায় পশ্চিমে যায় ডুবে।
দিনের সকল কাজে,
স্বপ্ন-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে,
ওই ঘরে, ওই মাঠে,
ওইখানে জল-আনার পথে ভিজে পায়ের ঘাটে,
পাখি-ডাকা ওই গ্রামেরই প্রাতে,
ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা—
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।

তারা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ওই আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রিদিনকে-কাঁদিয়ে-তোলা ব্যাকুল প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্‌বেলতা,
তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে
মানবচিত্ত-তুঙ্গশিখর হতে
সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া
কান্নাহাসির পাকে—
তাহা হলে তেমনি করেই দেখে নিতেম তাকে
চমক লেগে হঠাৎ পথিক দেখে যেমন ক'রে
নায়েগারার জলপ্রপাত অবাক দৃষ্টি ভ'রে।

যুদ্ধ লাগল স্পেনে ;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই-যে লক্ষ-কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্তমহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল ;
ওই তো তাহা সম্মুখেতেই, চার দিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায় নি তো
তাহারই মাঝখানে-বসা আমার চিত্তখানি।
এই প্রকাণ্ড জীবননাট্যে কে দিয়েছে টানি
প্রকাণ্ড এক অটল যবনিকা।

ওদের আপন ক্ষুদ্র প্রাণের শিখা
যে আলো দেয় একা,
পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি যায় না তাহে দেখা।

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে
কোটিযোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।
কিন্তু এই-যে এই মুহূর্তে বেদন-হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে-দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্তজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরামহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র-আলোকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৪৪

ঘরছাড়া

তখন একটা রাত— উঠেছে সে তড়বড়ি,
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রেতে ঘড়ি
কর্কশ সংকেত দিল নির্মম ধ্বনিতে।
অঘ্রানের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে

ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।
পিছে পড়ে থাকে
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।
জরাগ্রস্ত তক্তপোশ কালিমাখা-শতরঞ্চ-পাতা ;
আরামকেদারা ভাঙা-হাতা ;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ-ধরা ;
পোকা-কাটা হিসাবের খাতা-ভরা
কাঠের সিন্দুক এক ধারে ;
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি ;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়,
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা।

ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকারপরুষরবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে-তিন।

শূন্যপানে চক্ষু মেলি
দীর্ঘশ্বাস ফেলি
দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার।
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়ালো বাহিরে।

ঊর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর-অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।
সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের
পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের পাতা-ছাওয়া— ক্ষীণ আলো করে মিট্‌মিট্‌,
পাশে ভেঙে-পড়া পাঁজা। তলায় ছড়ানো তার ইঁট।
রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে
লুপ্তরেখা সংসারের ছবি— ধান-কাটা কাজে
সারাবেলা চাষীর ব্যস্ততা;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈহৈ রবে; হাটবারে ভোরবেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা;
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ও পারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে চলা।
নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।

যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
আঁকাবাঁকা গলি
রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি;

দুই পাশে বাসা সারি সারি;
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরামশয্যা 'পরে।
নিবিড়-আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া শুক্লতাকে
শুকতারা দিল দেখা।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত স্বরে
দূর হতে দূরে।

শ্রীনিকেতন
২২ নভেম্বর ১৯৩৬

জন্মদিন

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে—
সজনে পাতার মতো যাদের হালকা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙিন করছে ওরে,
নিলাজ মঞ্চে রাখছে তুলে ধরে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত;
লুকোয় কোথা ভেবে না পায়, আড়াল ভূমিসাৎ।

দাও-না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ-আলো শ্যামল-ছায়া বিরল-কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি-'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।

ভোরবেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে
ঠেকল যখন সব-প্রথমের চেনাশোনার দেশে,
নামল ঘাটে যখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগল আকাশ থেকে—
যেমন করে লাগে তরীর পালে,
যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে।
নাম ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টিসুরের দাম;
কানে কানে সে নাম ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুইপ্রহরে।
আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি
সেই নিমেষের তারিখ দিল লিখি।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে;
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে;

সর্ষেতিসির খেতে
দুইরঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে—
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই-যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না যদি রয় নাই রহিল নাম—
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

আলমোড়া
২২ বৈশাখ ১৩৪৪

প্রাণের দান

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তার পর হতে তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায়-ফেলায়।
প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।
আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে ; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায় ; পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

শান্তিনিকেতন
১ মার্চ ১৯৩৮

নিঃশেষ

শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ-বেগ ;
ক্লান্তি-আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিক্‌হারা তার ঝড়ের মত্ত লীলা,
বিদ্যুৎপ্রিয়া স্মৃতির গভীরে হল অন্তঃশীলা।
সময় এসেছে, নির্জনগিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।
অস্তসাগরপশ্চিমপারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্তঋষির নীরব বীণার রাগিণীতে লীন হবে।
তবু যদি চাও শেষদান তার পেতে,
ওই দেখো ভরা খেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে—
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।

শান্তিনিকেতন
৮।৪।৩৮

প্রতীক্ষা

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয় নি যে দেখা আজো কোনোখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি।

বাতাসে আকাশে যে নবরাগিণী
জগতে কোথাও কখনো জাগে নি
রহস্যলোকে তারি গান সাধা
চলে অনাহত রবে।
ভেঙে যাবে বাঁধ স্বর্গপুরের,
প্লাবন বহিবে নূতন সুরের,
বধির যুগের প্রাচীন প্রাচীর
ভেসে চলে যাবে তবে।

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি,
যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৬

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি
পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা;
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে—
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণলিখন-পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।'

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ ১৩৪৩

পালের নৌকা

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালের নৌকা ছাড়ি—
গাছের পরে গাছ ছুটে যায়, বাড়ির পরে বাড়ি।
দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রামে
ঘাটের পরে ঘাটগুলো সব পিছিয়ে চলে যায়
ভোজবাজিরই প্রায়।

নাইছে যারা তারা যেন সবাই মরীচিকা
যেমনি চোখে ছবি আঁকে মোছে ছবির লিখা।
আমি যেন চেপে আছি মহাকালের তরী,
দেখছি চেয়ে যে খেলা হয় যুগযুগান্ত ধরি।
পরিচয়ের যেমন শুরু তেমনি তাহার শেষ—
সামনে দেখা দেয়, পিছনে অমনি নিরুদ্দেশ।
ভেবেছিলুম ভুলব না যা তাও যাচ্ছি ভুলে,
পিছু-দেখার ঘুচিয়ে বেদন চলছি নতুন কূলে।

পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া।
এই নাড়াতেই লাগছে খুশি, লাগছে ব্যথা কভু,
বেঁচে-থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু।

বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া—
এ'কেই বলে জীবনতরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।
তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড় টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধারতীর্থগামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা—
যে সমুদ্রে অস্তে নামে কালপুরুষের তারা।

আলমোড়া
৮।৬।৩৭

চলাচল

ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের ;
ওরা কাজে চলছে ছুটে, তুমি কাজের পারের।
বয়স তোমায় অনেক দিল, অনেক নিল কেড়ে ;
রইল যত তাহার চেয়ে অধিক গেল ছেড়ে।
চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে ;
কোনো চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।
যেথায় ছিল চেনা লোকের নীড়
অনায়াসে জমল সেথায় অচেনাদের ভিড়।
তুমি শান্ত হাসি হাস যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাবে।

আলমোড়া
২৯ মে ১৯৩৭

মায়া

করেছিনু যত সুরের সাধন
নতুন গানে,
খসে পড়ে তার স্মৃতির বাঁধন
আলগা টানে।

পুরানো অতীতে শেষে মিলে যায়—
বেড়ায় ঘুরে,
প্রেতের মতন জাগায় রাত্রি
মায়ার সুরে।

২

ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায়
যে সুরখানি
স্বপ্নগহনে লুকিয়ে বেড়ায়
তাহার বাণী।
বুকের কাঁপনে নীরবে দোলে সে
ভিতরপানে,
মায়ার রাগিণী ধ্বনিয়া তোলে সে
সকলখানে।

৩

দিবস ফুরায়, কোথা চলে যায়
মর্তকায়া—
বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়
ছায়ার ছায়া।
নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা
দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা,
স্বপ্ন আসিয়া রচি দেয় তার
রূপের মায়া।

[শান্তিনিকেতন
অক্টোবর ১৯৩৭]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ,

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন,
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্যমাঝে
অমল শুভ্রতার।

শান্তিনিকেতন
১৯।৮।৩৮

ছুটি

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে— ছুটির মহাদেশ।
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটি সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

—

নাটক ও প্রহসন

নবীন

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনপ্রান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।
নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে নৃত্যগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত—
ভবনে ভবনে
বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

শুনেছ অলিমালা, ওরা ধিক্কার দিচ্ছে ওই ও পাড়ার মল্লের দল ; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগুচ্ছবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা গুহাদ্বারে ভ্রূকুটি পুঞ্জিত করে বসে আছে। কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন করেই বেরিয়ে পড়ুক এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে ; চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের অঙ্গুলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের

অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ওই অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধনটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য আজ নির্ঝরিত করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
ঊষার শুকতারা
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

—

তুমি সুন্দর যৌবনঘন,
রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপূর্তি।
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাস্ফূর্তি॥

ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা ধুম্‌ধাম্‌-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুকনো মেজাজে জোর পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু, যাঁদের রসবেদনা আছে

তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল!' সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরু করে দাও।

আন্‌ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো',
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে॥

আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাঞ্চল-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কিণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূন্য হাতে আসি নি। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রশি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরঙ্গে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।

তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।

পূর্ণিমাসন্ধ্যায়
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙিন স্বপন -মাখা—
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লায়ী রে'। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিক-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শুধু কেবল গাই নে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে।

কমলবরন গগনমাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক,
নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

মধুরিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ওই কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হয়ে পড়েছে ওই আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ারস্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরাকুলে
আলোর মালা চামেলিবরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আর-এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু, ওই-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ একদিনের মতো ঘরছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগল-যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

বেণুবন মর্মরে দখিনবাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

—

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

সর্বনাশের ব্রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ওই দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ওই অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনছ না বকুলগুলো ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল বলে উঠছে 'কিছু হাতে রাখব না'। যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন— আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি।

কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

—

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে,
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।

নন্দিনী, ওই দেখে নাও শিশুর লীলা, ওই-যে কচি কিশলয়—

শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা— দেখে যা—
কল-উতরোল চঞ্চলদোল ওই-যে বোবা।

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নবপল্লবদল।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো—
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোরকোলাহল।

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়— তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙিন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।
সে-যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্বত।

দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে
ভরে যায় দু'নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি

তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

—

বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে,
তা নিয়ে তোমার লাগি রেখেছি ডালি ভরে।

টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গাঁথব— সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্‌বৃত্ত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

দ্বিতীয় পর্ব

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে
মিলনলগন গত হলে।
স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায় পাতায় ঝর ঝর করে উঠছে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা হচ্ছে— মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরুয়া রঙে নামল।

চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীরভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধসনে হল মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

—

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে,
রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ওই চোখে।

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি; তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে—
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক্‌।

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্‌॥

—

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হল। ত্বরা কর্‌ গো, ত্বরা কর্‌— বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে— তার পরে আছে করুণ ধূলি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছলি।

এখনো বনের গান
বন্ধু, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি॥

'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে'। বসন্তের ভূমিকায় ওই পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।'

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।

ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

—

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

মন ছিল সুপ্ত, কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনা-গোনা। জেগে উঠে দেখি ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি, ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।

গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শাল,
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের সুগন্ধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মরমুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব নয়নে॥

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্‌গা করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের সুর এসে পৌঁছয় বিচ্ছেদসমুদ্রের পরপার থেকে— মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে করুণ সুরে (হায় দূরে)
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
  মম পান্থচিত চঞ্চল
    জানি না কী উদ্দেশে।

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
    ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
    নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে

৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭

—

পরিশিষ্ট

প্রথম অভিনয়কালে 'নবীন' যে আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এই পরিশিষ্টে সংকলিত হইল। যে গানগুলি প্রচলিত 'নবীন' গ্রন্থে বা অন্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহাদের প্রথম ছত্রই কেবল দেওয়া গেল। 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' গানের পাঠান্তর 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে' গানটি পুনর্মুদ্রিত হইল। 'বেদনা কী ভাষায় রে' প্রচলিত গ্রন্থে বর্জিত হইলেও, প্রথম প্রকাশিত নবীনের অন্তর্ভুক্ত নবরচিত গান হিসাবে সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত হইল।

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শুনেছ অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ওই ওপাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবালপুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করছে, নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে— চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা

একটা ফর্মাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছু চাই— কিন্তু যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান শুরু করে দাও।

আন্‌ গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পঞ্চমরাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শূন্যহাতে

আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই-তরী রশি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দখিন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছু সংকোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে

মধুরিমা, দেখো, দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল— কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শুভ্র মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে— জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অন্তর থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজার আগল এঁটে বসেই রইল— হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো— কিন্তু সে ঢেউ-যে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ। এ দিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে, চঞ্চলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখির ডানায়— আর ওই কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে নিবাত-নিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হল?

এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা[১]

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ওই মাধবীর দ্বিধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্‌ভতা অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ওই অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে— বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠছে 'দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত'। যে পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। কৃপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী। যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে-যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়ালে থাকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকার যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌঁছয়। লুকিয়েই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া[১]

এইবার বেড়া ভাঙল, দুর্বার বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যখন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গুনে গুনে আসেন না। একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এল সোহন বেশে,
কুয়াশাভার গেল ভেসে,
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।

এবার জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে।[২]

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে ; এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে ওই, শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ওই তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল

আবার একবার চেয়ে দেখো— অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছ তাকে দেখে নাও তার আপন মহিমায়। ওই দেখো ওই বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন বলে চেনে ; দখিন হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায় 'কেমন আছ'। তোমার গানে আজ ওকে গৌরব দিক। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাতাসে[১]

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছে। সকলের আগেই উৎসবের সদাব্রত ও শুরু করে দিয়েছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না— তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিঁড়ে

নিজেও বেরিয়ে না পড়লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবে কী করে? আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো সুখের হার গাঁথব— পরাব ওকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি। ফাগুনের ভরা সাজি থেকে যা-কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা— আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে বেঁধে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে

দ্বিতীয় পর্ব

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গন-দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে॥

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আম্রমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস— অবসানের গোধূলিছায়া নামছে।

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল।

তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে— তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথি। তোমাকে সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে— তার চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না বুঝি, এ দিকে বসন্তর পালা তো সাঙ্গ হয়ে এল। ওর মল্লিকাবনে এখনি তো পাপড়িগুলি সব পড়বে ঝরে— তখন বাণী পাবে কোথায়। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্। বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ করে দে; তার পরে আছে করুণ ধূলি, তার আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সুন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায় হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ওই পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে; বললে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়; উত্তরীয়ের গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগুলি লুটিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে; তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকর-গুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া; কিন্তু জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন্ দিলে পরায়ে

বনবন্ধুর যাবার সময় হল, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল, বিষাদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল

দূরের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বঙ্কিম পথেই চির-দিন তোমার রথযাত্রা ; যখন পিছন ফিরে চলে যাও সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায়— শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই নে, হায় হায় করি।

এখন আমার সময় হল[১]

বিদায়বেলার অঞ্জলি যা শূন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্‌খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে[১]

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের সুগন্ধ, তোমার বাঁশীর গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও— শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়[১]

পথিক চলে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলগা করে দেয়। একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়— জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজি-নীলা দিগন্তরেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক শুনতে পাই কোন্ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে— উদাস হয়ে যায় মন— কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।

বাজে করুণ সুরে, হায় দূরে

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার

খেলা পুরো হল না— খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধুলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা[৩]

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক লীলা, শমে এসে সব তান মিলুক, শান্তি হোক্‌, মুক্তি হোক্‌।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক[১]

৩০ ফাল্গুন ১৩৩১

১ দ্রষ্টব্য : বসন্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড

২ তুলনীয় : হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে। নটরাজ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড

৩ দ্রষ্টব্য : ফাল্গুনী। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড

শাপমোচন

ভূমিকা

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গান-গুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাপমোচন

ভূমিকার গান। ভাবটা এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সজ্জ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।

এ শুধু অলস মায়া— এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শুধু আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারি ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায়, খেলার সাথী কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে॥

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহীচিত্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, নৃত্যে উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়,
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন,
পুণ্য লগন

হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়।

যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে,
পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণগানে
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়॥

স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে।

মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, "ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।"

শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, "তথাস্তু, যাও মর্তে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"

বিদায়গান

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি,
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি।
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
হৃদয়ের নূতন বাণী।

যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার রবে
ধেয়ানে আলোকরেখা।

সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি ॥

—

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা। স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সঙ্গে এনেছে অরুণেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।

জাগরণে যায় বিভাবরী,
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।

বাণী নাহি তবু কানে কানে
কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে
বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি ॥

তাপার্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তৃষ্ণার জল, বীণা কোলে নিয়ে গান করে—

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের বক্ষস্থল, কলকল ছলছল।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে,
এসো হে নির্মল, কলকল ছলছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়।

তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগাক গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়—
আয় আয় আয়, সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল ছলছল।

অনাবৃষ্টি কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে,
ভেঙে নীরসের কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল ছলছল॥

কেমন করে কমলিকার ছবি এসে পড়ল গান্ধারে রাজ-অন্তঃপুরে। মনে হল, যা হারিয়েছিল এই-জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে।

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে,
স্বপ্নে-ছাওয়া দখিন হাওয়া আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল ;
মর্মরিত মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

ছবিখানি দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।

তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও—
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি!
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি॥

রাজা লিখলেন চিঠি চিত্ররূপিণীর উদ্দেশে। লিখলেন—

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা, বরণমালা।
প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রুগালা।
গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

চিঠি পৌঁছল রাজকন্যার হাতে। অজানার আহ্বানে তার মন হল উতলা। সখীদের নিয়ে বারবার করে পড়লে সেই চিঠি।

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্তকেশে।

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য-ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে॥

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বললে, "আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।"

সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে বললে —

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে॥

চৈত্রপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন। সেই বিবাহরাত্রে দূরে একলা বসে রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল। কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকান্তরে কার সঙ্গে এইরকম জ্যোৎস্নারাত্রে সে যেন এক-দোলায় দুলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়েছে মনে। একটা পদ তার মনে গুঞ্জরিয়া উঠছে 'ভুলো না— ভুলো না — ভুলো না'—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহালগনে।

এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিব যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না ॥

যথালগ্নে রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে। সখীরা দূরোদ্দিষ্ট বন্ধুর আবাহনগান গাইলে—

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো
ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি ধুলায় ফেলে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন করো গন্ধবারি,
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে এল গো—
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো গো।

সকল ধন্য যে ধন্য হল হল গো,
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলকমগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে এল গো—
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধরে ওই আলোতে জ্বেলো গো ॥

অন্তঃপুরিকারা বীণাখানিকে বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে, বধূকে আহ্বান করে গাইলে—

বাজো রে বাঁশরী বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।
বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে,
মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো।

রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে, সৌরভমন্থর বায়ে,
বন্দনসংগীতগুঞ্জনমুখরিত
নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

বীণার সঙ্গে রাজকুমারীর মালা বদল হল। সখীরা এই বীণা সুন্দরকে উৎসর্গ করে গাইলে—

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,
নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।

পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে—
পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্তমাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি ॥

বধূ পতিগৃহে যাবার সময় সখীরা সুন্দরকে প্রণাম করে বললে—

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে।
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে— আমার সকল কর্মে লাগে—
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে—
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণদোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে—
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

—

রাজবধূ এল পতিগৃহে।

দীপ জ্বলে না, ঘর থাকে অন্ধকার, সেই ঘরে প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূ সমাগম।

কমলিকা বলে, "প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"

এসো আমার ঘরে,
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো,
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বুকের 'পরে ॥

রাজা বলে, "আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।"

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—

তখন ঘুচবে ত্বরা, ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়।

চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়—
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্তদেহে। নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে আঘাত করে, নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে দেয় প্লাবিত করে।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহর, শুকতারা পূর্বগগনে; কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে দিলে রাজার দুই পা ঢেকে; বললে, "আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব। নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই, রেখে যাই আমার কান্না এই অন্ধকারের বুকে— যতক্ষণ না আমাকে ফিরে ডেকে আন তোমার আলোর সভায়।"

আমি এলেম তোমার দ্বারে,
ডাক দিলেম অন্ধকারে।
আগল ধরে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া,
দেখতে পেলেম না তোমারে।
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাব রেখে।
দেখা তোমার পাই বা না পাই
দেখতে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে॥

রাজা বললে, "প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখনো তুমি অন্তমনে আছ, শুভদৃষ্টির সময় তাই এল না।"

আন্‌মনা গো আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব' তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা।

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে মন্দমৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে—
একলা আমি বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা॥

মহিষী বললে, "প্রিয়প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষু চিরদিনই কি থাকবে বঞ্চিত। অন্ধতার চেয়ে এ যে বড়ো অভিশাপ।"

অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।

রাজা বললে, "কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে দেখো চেয়ে।"

মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। বললে, "চিনব কী করে।"

রাজা বললে, "যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো। সেই কল্পনাই হবে সত্য।"

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

কেমন করে জানাই তারে, বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোছায়ার রঙিন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

—

আজি দখিন দুয়ার খোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়ালফুলের রেণু,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।

এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে—
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো॥

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। মহিষী বললে, "দেখলেম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের অধিকার।"

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পরে উঠল গেয়ে, "অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।"

"না মহারাজ, না" বলে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে লাগল অশ্রুর ছোঁওয়া। বললে, "যাকে দয়া করলে যেত তোমার হৃদয় ভরে, তাকে ঘৃণা করে কেন পাথর করলে মনকে।"

"রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে" বলে মহিষী উঠে পড়ল আসন থেকে।

রাজা হাত ধরে বললে, "একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে, "অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি। আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলেম।"

রাজা গাইলেন—

বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
রসের প্রসাদ মাঙবে কি।
রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা,
লাজের রাঙা মিটলে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি।
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে।
অভিমানের কালো মেঘে বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি॥

মহিষী স্তব্ধ হয়ে রইল। রাজা বললে, "আচ্ছা, কথা তোমার রাখব, কিন্তু তাতে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে না।"

জ্বলে উঠল আলো, আবরণ গেল ঘুচে, দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। "কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা" বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তাকে ডাক দিলে রাজার জগৎ থেকে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা, কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা, সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো॥

—

গেল বহুদূরে, বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে। কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, আধোঘুমে সে শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী। স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সুর চিরদিনের চেনা। চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু বুকের মধ্যে উছলে ওঠে।

সখী, আঁধারে একেলা ঘর মন মানে না।
কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।
ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো,
যেন কার বাণী কভু প্রাণে আনে কভু আনে না॥

রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে তাকে চোখে দেখি নে, তার হৃদয় দেখি— জনশূন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায় যেন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার। রানী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা। যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।

তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে॥

কী হল রাজমহিষীর। কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহ জাগিয়ে তোলে। কোন্ রাত-জাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া। আকাশে আকাশে

তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র। বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাইরে নেই ; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।

ওই বুঝি বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি ভয়ে লাজে।
কী জানি কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

রাজমহিষী বিছানায় উঠে বসে, স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ। বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।

কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল, দেখার পরে যাকে ভুলেছিল তারই দিকে।

একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ। মহিষী দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে। নীচে সেই ছায়ামূর্তির নাচ, বিরহের সেই উর্মিদোলা।

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা।
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে,
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা।

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরমকামনা॥

মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লিঝংকৃত রাত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য কথা কয় যেন স্বপ্নে। বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল মহিষীর অঙ্গে অঙ্গে। কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

বীণায় বাজে পরজের বিহ্বল মীড়। কমলিকা আপন-মনে বলে, 'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আর দেরি নেই, দেরি নেই।'

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়। আঁধারের ডাক গভীর। রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "যাব আজ। আর ভয় করি নে আমার দৃষ্টিকে।"

পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে গেল সে অশথতলায়— সেখানে বীণা বাজছে।

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে পীতবসনপ্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে।

অম্বরপ্রাঙ্গণমাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়াল।

রাজা বললে, "ভয় কোরো না, প্রিয়ে, ভয় কোরো না।"

গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরুগুরু ধ্বনির মতো।

"কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই।"

এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুলে ধরলে রাজার মুখের কাছে।

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার!"

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে॥

—

সংযোজন

১

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণবিন্দুর
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়,
সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়,
মধুর লজ্জা রচিব শয্যা
যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে॥

[১৯৩৩]

২

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগো একাকী শূন্য মন্দিরে—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ লাগি
আছ চাহিয়া।

স্বপনরূপিণী আলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায়
হৃদয়মাঝারে॥

[শান্তিনিকেতন
১৪ নভেম্বর ১৯৩৩]

৩

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন
নবজলধরকান্তি ঘননীল অঞ্জন,
নমো হে, নমো নমো।
নন্দনবীথির ছায়ে
তব পদপাতে নব পারিজাতে
উড়ে পরিমল মধুরাতে,
নমো হে, নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীরবন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগঞ্জন
নমো হে, নমো নমো॥

[পানাদুরা। সিংহল
২৬ মে ১৯৩৪]

৪

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধু
দক্ষিণসমীরণে।
কেন বঞ্চনা কর মোরে,
কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে,
দেখা দাও দেহমন ভ'রে
মম নিকুঞ্জবনে।
দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে,
দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।
কেন শুধু বাঁশরীর সুরে
ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও
দৃষ্টির বন্ধনে॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

৫

বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে।
বুঝি স্বপ্নরূপে ছিলে চন্দ্রলোকে।
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিনরাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনঘন অন্ধকারে—
জন্ম জনম গেল বিরহশোকে।

অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জবনে
সংগীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত বধূ দুঃখরাতি
পোহাইল নির্জনে শয়ন পাতি।
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তারি আনো বহে
তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে॥

২০।৯।৩৪

৬

দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে।
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।

মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে,

বকুলশাখার চঞ্চলতায়
মর্মরে মর্মরে

পুষ্পমালার পরশপুলক
পেয়েছ বক্ষতলে।
রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া
সুখের অশ্রুজলে।

ধরো সাহানাতে মিলনের পালা,
সাজাও যতনে বরণের ডালা,
মালতীর মালা,
অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ
আনো তার পথ-'পরে

২১।৯।৩৪

৭

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে—
বহু- পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি
এই মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী,
স্থির নির্ঝরিণী,
যেন ফাল্গুন-উপবনে শুক্লরাতে,
দোলপূর্ণিমাতে,
এল ছন্দমুরতি কার নব অশোকে।

নৃত্যকলা যেন চিত্রে লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা,
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা
কোথা হারাইল চঞ্চলতা।

হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি
নন্দনমন্দারমাল্যখানি,
বরমাল্যখানি,
প্রিয়- বন্দনগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে ॥

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

৮

মায়াবন-বিহারিণী হরিণী,
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ, অকারণ।
থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন, অকারণ

চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন, অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব,
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন, অকারণ ॥

২৯ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]

৯

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে,
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে।
সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার,
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার,
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।

আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তার বাণী যে,
জানি তারে আমি তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই,
অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই,
আমার ভুবন রবে কি কেবলি আধা রে॥

৩০ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]

১০

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—
কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে।
আজ আলো-আঁধারে
কখন্ বুঝি দেখি কখন্ দেখি না তারে।
কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে।
ধরা-অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে—
কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি আঁচল লাগে আমার গায়ে॥

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

—

কালের যাত্রা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে

কবির সস্নেহ উপহার

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

রথের রশি

রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

প্রথমা

এবার কী হল ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল—
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

দ্বিতীয়া

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি পসারিরা চুপচাপ ব'সে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন্ আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে।

দ্বিতীয়া

ওই দেখ্, পুরুতঠাকুর বিড়্ বিড়্ করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর!
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না— লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ওই যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না

সন্ন্যাসী

ওই তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।

প্রথমা

ও ভাই, পুজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পুজোর কথা তো ছিল না—
ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।
চল্‌-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনি গে পুজো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্‌ দেখ্‌ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ওই দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো ক'রে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে। আঁকুবাঁকু করছে বুঝি।

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ওই দেখ্ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উলটো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি। এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ওই পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ওই রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্‌দব্‌ করছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।
গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্‌ মেলছে রসনা।
পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রলয়দীপ্তির আঙটি পরেছে দিক্‌চক্রবাল।

[প্রস্থান

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই
এক-এক যুগ যায় বয়ে—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটো গে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে-না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ওইখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো-না ভাই, সবাই মিলে— জয় দড়ি-নারায়ণের জয়

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ? দেখি নে তো চক্ষে।
দড়ি-প্রভুকে দেখছি প্রত্যক্ষ—
হনুমানপ্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
মরণকালে ওই দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ,
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো।

প্রথমা

যেন যমুনানদীর ধারা।

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পুজো এনেছি ঠাকুর!
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কী হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।
চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট ক'রে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিঁকছে না।
ভেঙে পড়ল ব'লে।

[প্রস্থান

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পুজো দিই গে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি,
কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।
নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্ রে। দড়িটা পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাচ্‌কোঁচ্‌ও করলে না চাকাটা।

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ওই ওরা— যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসৃষ্টি।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্ধা—
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদশান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!

দ্বিতীয় সৈনিক

চল্‌-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন্ বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।

ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুকি ম'রে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে।
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম
ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর-এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বলো, পারব না!
সবচেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্‌ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,
কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল
দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।
রাজার চর পৌঁছল গুহায়,
তখন প্রভু আছেন চিত হয়ে বুকে দুই পা আটকে।
তুরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদি বা ভাঙল,
পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ।

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী দাদা!
পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার।
বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।
জিভটার চাঞ্চল্যে রাগ করে গোড়াতেই সেটা ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পঁয়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে।

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারি নে। বিষম ভারী।

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু! টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত।

সকলে

ছুয়ো ছুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মান রক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ওই সোজা কাজটাই জান তোমরা।
মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।
মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এই বেলা সামলাও গে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্দুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুদ্ধ রইল উপোস করে!
কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,
নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাই নে তোমার দয়ার।
নমো নমো!

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে,
ঠিকদুক্কুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরে— ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
এক ডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর-চন্দন লাগা;
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—
মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
আমার দেওরপো পেট-রোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ওই তো ধোঁওয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।
কিন্তু জাগলেন না তো।
দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি—
গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা।
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ওইখানকার কাদাটা দে তো, ভাই, আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা, কত কষ্ট পেলেন প্রভু!
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রতনিয়ম করো গে।
আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ওই ধোঁওয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ওই বিল্বিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল।

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে— বলছে, রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে।

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ওই-যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।

মন্ত্রী

তাই তো দেখলেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ।

পুরোহিত

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর?

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে—
লাগল বলে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেছে উলটো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী
সৈনিকের প্রতি

চুপ করো।
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ওই চেয়ে দেখ্ রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা।

মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে।
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে।
চল্‌ রে চল্‌, দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

এ কি, এ কি, চাকার শব্দ নাকি —
না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে?

পুরোহিত

হতেই পারে না— কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ওই তো চলেছে।

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল — পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে।
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পুরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোওয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না।
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায়?

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই এক সারে রশি ধরা!
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেক কাল চণ্ডালের রক্ত শুষে চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি?
রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে।
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ওই দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।
বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—
দো-মনা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!
সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রশি ধরব না লড়াই করব?
ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরোহিত

কী জানি, রশি ধরব না শাস্ত্র আওড়াব।

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনি নি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখো-না, ওরাই কি টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে।

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলছে জেগে উঠে। বাপ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপর চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ওই যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা— শাস্ত্র জানে কী?

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উলটোপালটা ব্যাপার কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর-একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর !
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে,
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার এক পাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ও দিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে কবি !

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল ?

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর !
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে !
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া !
ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পুজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।
ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল—
রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা— যাদের নাম করতে নেই ?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়— মহাকালনাথের জয়!

—

কবির দীক্ষা

কবির দীক্ষা

আমি তো ভরতি হয়েছিলেম তোমার দলেই।

দৌড় দিলে কেন।

ভয়ে।

ভয় কিসের।

ভবভয়নিবারিণী সভার সভাপতি—

আহা, পরম ধার্মিক—

বললেন আমাকে, ওই লক্ষ্মীছাড়াটা—

থামলে কেন।
আমি জানি বলেছেন,
লক্ষ্মীছাড়াটা দিচ্ছে তোমাকে রসাতলে।

একেবারে ওই শব্দটাই—
রসাতলে।

অন্যায় তো বলেন নি।

বলো কী কবি!

জীবন আমার যাঁর সাধনায় মগ্ন
সেই দেবতা তলিয়ে আছেন অতলে—

খুড়ো জ্যাঠারা বলেছেন সবাই—
তোমার দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা,
না আছে পরমার্থের।

পণ্ডিত মানুষ তোমার খুড়ো জ্যাঠারা,
বলেন ঠিক কথাই।

সর্বনাশ তো তবে।

সত্য কথাটি বেরল মুখে—
সর্বনাশ, ওইটের থেকেই সর্বলাভ—
সর্বনেশেই মন কেড়েছে কবির।

বুঝলেম কথাটা।
মিলছে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয়সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে—
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বল বেঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে।

জগৎজোড়া নাচগানেরই পালা আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দস্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
তত্ত্বানন্দস্বামীর নাচ!

শুনলে গম্ভীর গণেশ
বৃংহিতধ্বনি করবেন অট্টহাস্যে।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়েছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ।
উপুড় করবে শূন্য ঘড়াটাকে ?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ কবি !

ত্যাগের রূপ দেখো ওই ঝর্নায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগী,
তবে সব-আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিব ভিক্ষুক, সেটা তো মানো।
মহত্ব দিলেন তিনি জগতের দরিদ্রকে।

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন ব'লে নয়—
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

ভরব কেমন করে তাঁর অসীম ভিক্ষার ঝুলি।

তিনি না চাইলে খুঁজেই পেতেম না দেবার ধন।

বুঝলেম না কথাটা।

কিছু তিনি চান নি কুকুর-বেড়ালের কাছে।
'অন্ন চাই' বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।
বেরল মানুষ লাঙল কাঁধে—
যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।

বললেন 'চাই কাপড়'।
হাত পেতেই রইলেন—
বেরল ফলের থেকে তুলো,
তুলোর থেকে সুতো,
সুতোর থেকে কাপড়।
ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম
তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।
নইলে দিন কাটত কুকুর-বেড়ালের মতো।
তোমরা কি বলো সব-চেয়ে বড়ো সন্ন্যাসী ওই কুকুর-বেড়াল।
তত্ত্বানন্দস্বামী কী বলেন।

তিনি বলেন, শিবের ভিক্ষার ঝুলির টানে আমরা হব নিষ্কিঞ্চন।
যার কিছু নেই দেবার, তার নেই দেনা।
সংসারের নালিশ একেবারে বন্ধ তার নামে।

মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি,
তবে ভিক্ষু দেবতার ব্যাবসা হবে যে অচল।
তাঁর ভিক্ষের ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী—
যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।

তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, মিথ্যে নয় পুরাণের কথাটা।
ভিক্ষুক শিবের বরেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা।
কিন্তু আগুন কেন লাগে সে লঙ্কায়।

সে যে করলে ভিক্ষে বন্ধ। লাগল জমাতে।
দিতে যেমনি পারলে না, যেমনি লাগল কাড়তে,
অমনি ঘটল সর্বনাশ।
ভিক্ষু দেবতা দ্বারে বসে হাঁকেন, দেহি দেহি।
তবু আমরা কোণে বসে আছি নেংটি প'রে, দেবো কিই বা!
কেউ বা লোভে পড়ে ভাঙতে চায় না জমানো ধন।

তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বলবে শিবের চেলা।

বলতে হয় বৈকি।
নইলে এত উন্নতি কেন।
মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবি।
তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ—
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

অশান্তিও তো কম দেখছি নে ওদের মধ্যে।

যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে
উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।
আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিই নে কিছু।
তাই মরছি সব দিকেই—
খেতে ফসল যায় মরে,
পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,
দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।

কিন্তু গোড়ায় বলছিলে যে রসের কথাটা
শিবের ঝুলিতে তো তার খবর মেলে না।

মেলে বৈকি। গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস।
যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ওই দেবতাকে।

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে
দ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও' 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কণ্ঠে—
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

—

পরিশিষ্ট

রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।

১ নাগরিক। মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছুতেই নড়লেন না। কার দোষে হল তা জানি, গণৎকার গুনে বলে দিয়েছেন।

২ নাগরিক। হয়তো কারো দোষ নেই, হয়তো মহাকাল ক্লান্ত, আর চলতে রাজি নন।

১ নাগরিক। আরে বল কী। চলতে রাজি না হলে আমাদের চলবে কী করে। ওই দেখো-না, রথের দড়িটা পড়ে আছে, কত যুগের দড়ি— কত মানুষের হাত পড়েছে ওই দড়িতে, এমন করে তো কোনোদিন ধুলোয় পড়ে থাকে নি।

৩ নাগরিক। রথ যদি না চলে, আর ওই দড়ি যদি পড়ে থাকে, তা হলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে।

৪ নাগরিক। বাবা রে, ওই দড়িটা দেখে ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে উঠবে।

৩ নাগরিক। দেখ্‌-না ভাই, একটু একটু যেন নড়ছে মনে হচ্ছে।

১ নাগরিক। আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে ওঠে, তা হলে যে সর্বনাশ হবে।

৩ নাগরিক। তা হলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তা হলে রথটা চলবে আমাদের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলেই তো ওর চাকার তলায় পড়ি নে। এখন উপায়?

১ নাগরিক। ওই দেখ্‌-না, পুরুতঠাকুর বসে মন্ত্র পড়ছে।

২ নাগরিক। রথযাত্রায় সব আগেই ওই পুরুতঠাকুরের দলরাই তো দড়ি ধরে প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র পড়েই কাজ সারবেন নাকি।

৪ নাগরিক। চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাকতে সবার আগে ওঁরাই তো একচোট টানাটানি করে নিয়েছেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে।

৩ নাগরিক। ওই দেখ্‌, আমার কেমন মনে হচ্ছে ওই রশিটা যেন যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মতো দব্‌দব্‌ করছে।

২২।১২

১ নাগরিক। আমার মনে হচ্ছে ওই রথ চলবে কোনো এক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে।

২ নাগরিক। আরে, রথ চালাতে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে বসে থাকলে শুভলগ্নও তো বসে থাকবে না। ততক্ষণে আমাদের মতো পাপাত্মাদের দশা হবে কী।

১ নাগরিক। পাপাত্মাদের দশা কী হবে সেজন্য ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

২ নাগরিক। বলিস কী রে। পুণ্যাত্মাদের জন্যে এ জগৎ তৈরি হয় নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই জন্যে। দৈবাৎ দুটো-একটা পুণ্যাত্মা দেখা দেয়, বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না— আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

১ নাগরিক। তা হলে তুমিই দড়াটা ধরে টান দাও-না দাদা— দেখা যাক রথ এগোয় না দড়াটা ছেঁড়ে, না তুমিই পড় মুখ থুবড়ে।

২ নাগরিক। দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাতটা এই যে, গুন্‌তিতে তারা একটা-দুটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চলবেই। মিলতে পারলেম না বলে টানতে পারলেম না, পুণ্যাত্মাদের জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেম।

৪ নাগরিক। ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে উঠল, কথাবার্তা সামলে বলিস রে।

১ নাগরিক। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মমুহূর্তে রথের প্রথম টানটা পুরোহিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার— সেও তো হয়ে গেল, রথ এগোল না— এখন তৃতীয় টানটা কার হাতে পড়বে।

সৈন্যদলের প্রবেশ

১ সৈন্য। বড়ো লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধরে টান দিলুম, চাকার একটু ক্যাঁচকোঁচ শব্দও হল না।

২ সৈন্য। আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা তো শূদ্রের মতো গোরু নই— রথ টানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।

২ সৈনিক। কিম্বা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করছে কুড়ুলখানা নিয়ে রথটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পারেন।

১ নাগরিক। দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চলবেও না, রথ ভাঙবেও না। গণৎকার কী গুনে বলেছে তা শোন নি বুঝি?

১ সৈনিক। কী বল্ তো।

১ নাগরিক। ত্রেতাযুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘটবে।

১ সৈনিক। আরে, ত্রেতাযুগে তো লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল।

১ নাগরিক। সে নয়, সে নয়।

২ সৈনিক। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড?

১ নাগরিক। তারই কাছাকাছি। সেই-যে শূদ্র তপস্যা করতে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই তো সেদিন ক্ষেপে উঠেছিলেন। তার পর রামচন্দ্র শূদ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শান্ত করেছিলেন।

৩ সৈনিক। আজ তো সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিয়েছে, শূদ্রের তো কথাই নেই।

১ নাগরিক। এখনকার শূদ্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে। ধরা পড়লে বলে, আমরা কি মানুষ নই। স্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেছে যে তারা মানুষ। রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কী— না চললেই ভালো। যদি চলতে শুরু করে তা হলে চন্দ্রসূর্য গুঁড়িয়ে ফেলবে। শূদ্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা 'আমরা কি মানুষ নই'! কালে কালে কতই শুনব!

১ সৈনিক। আজ শূদ্র পড়ছে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধরবে লাঙল! সর্বনাশ!

২ সৈনিক। তা হলে চল্, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে হাত চালানো যাক। ওরা মানুষ না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।

২ নাগরিক। রাজাকে কে গিয়ে বলেছে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুদ্রা। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চলবে এইরকম সকলের বিশ্বাস।

১ সৈনিক। বেনের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরব।

২ সৈনিক। তা, রাগ করলে চলবে কেন। বেনের টান আজকাল সব জায়গাতেই লেগেছে। এমন-কি, পুষ্পধনুর ছিলেটা বেনের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার তীরগুলো বেনের ঘরেই তৈরি।

৩ সৈনিক। তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেনে।

১ সৈনিক। পিছনেই থাকে তো থাক্-না— আমরা তো থাকি ডাইনে-বাঁয়ে, মান তো আমাদেরই।

৩ সৈনিক। পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিন্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারই।

ধনপতির অনুচরদের প্রবেশ

১ সৈনিক। এরা সব কে।

২ সৈনিক। আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে পড়ছে।

৩ সৈনিক। গলায় সোনার হার নয়তো, সোনার শিকল বললেই হয়। কে এরা।

১ নাগরিক। এরাই তো আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। ওই সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেছে বলেই তাঁর রথ চলছে না।

১ সৈনিক। তোমরা কি করতে এসেছ।

১ ধনিক। রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারো হাতে রথ চলছে না, তাঁর হাতে চলবে বলেই সবাই আশা করে আছে।

২ সৈনিক। সবাই বলতে কে রে বাপু? আর আশাই বা করে কেন।

২ ধনিক। আজকাল যা-কিছু চলছে সবই যে ধনপতির হাতে চলছে।

১ সৈনিক। এখনই দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক। তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাও নি।

১ সৈনিক। চুপ বেয়াদব!

২ ধনিক। আমরা চুপ করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক। তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘ্নী যখন বজ্রনাদ করে ওঠে—

২ ধনিক। তোমাদের শতঘ্নী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে, এক হাট থেকে আর-এক হাটে ঘোষণা করবার জন্যে আছে।

১ নাগরিক। দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবে না।

১ সৈনিক। কী বল? পারব না!

১ নাগরিক। না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক খেয়েছে, কোনোটা বা ওদের ঘুষ খেয়েছে, খাপ থেকে বের করতে গেলেই তা বুঝতে পারবে।

১ ধনিক। শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্যে নর্মদাতীরের বাবাজিকে আজ আনা হয়েছিল। কী হল খবর জান?

২ ধনিক। জানি বৈকি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল, দেখল, প্রভু পদ্মাসনে দুই পা আটকে চিত হয়ে পড়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা দুখানা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।

১ নাগরিক। শ্রীচরণের দোষ কী। তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করে নি। তা, বাবাজি বললেন কী?

২ ধনিক। বলা-কওয়ার বালাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেছেন। গোঁ গোঁ করতে লাগলেন, তার থেকে যার যে-রকম খেয়াল সে সেই রকমেরই অর্থ করে নিলে।

১ ধনিক। তার পরে?

২ ধনিক। তার পর ধরাধরি করে বাবাজিকে রথতলা পর্যন্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধরলেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে যেতে লাগল।

১ ধনিক। হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েছেন, মহাকালের রথটাকে সুদ্ধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি?

২ ধনিক। ওঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের উপবাসের ভারে চাকা বসে গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের পা চলতে চায় না।

১ নাগরিক। উপবাসের ভারের কথা বলছ, তোমাদের অহংকারের ভারটা বড়ো কম নয়।

২ নাগরিক। সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ করে। দেখব আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেঁট না হয়।

১ ধনিক। আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে। সে তো আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠবে। পেট চলা হল সব চলার মূলে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি। মন্ত্রীমশায়, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন।

মন্ত্রী। রাজ্যে যখনই কোনো অনর্থপাত হয় তখনই তো তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি। অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আজকের সংকটটা কী রকমের।

মন্ত্রী। শুনেছ বোধ হয়, মহাকালের রথ আজ কারো হাতের টানেই চলছে না।

ধনপতি। শুনেছি। কিন্তু মন্ত্রী এ-সব কাজ তো এতদিন—

মন্ত্রী। জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু তখন যে এঁরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এঁরা তোমাদেরই দ্বারে অচল হয়ে বাঁধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চলবে না।

ধনপতি। অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো তো বাধা ঘটে নি। তখন আমরা তো কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেছি, রশিতে টান দিই নি তো।

মন্ত্রী। দেখো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চলছে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে না-ধরতে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মতো ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বল, শস্ত্রই বল, সমস্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে— অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

ধনপতি। আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে দেখুক, যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সামনে—

মন্ত্রী। কেন আর দেরি করা শেঠজি। রাজ্যের সমস্ত লোক উপোস করে আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা ব্যর্থ হল, দেশসুদ্ধ লোক তো তা দেখেছে।

ধনপতি। তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক ; জনসাধারণে তাঁদের বিচার করে একরকমে, আমাদের বিচার করে আর-এক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শুভাদৃষ্টের স্পর্ধা কোনো লোক ক্ষমা করতে পারবেই না। তখন কাল থেকে তোমরাই ভাবতে বসবে আমাকে খর্ব করা যায় কী উপায়ে।

মন্ত্রী। যা বলছ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের লোক খেপে যাবে।

ধনপতি। আচ্ছা, তবে চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। (দলের লোকদের প্রতি) বলো সিদ্ধিরস্তু !

সকলে। সিদ্ধিরস্তু !

ধনপতি। বলো, জয় সিদ্ধিদেবী !

সকলে। জয় সিদ্ধিদেবী !

ধনপতি। টানব কী ! এ রশি যে তুলতেই পারি নে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম। (দলের লোকের প্রতি) এসো, তোমরাও সবাই এসো। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাঞ্চি কোথায় গেল। এসো, এসো। এসো কোষাধ্যক্ষ ! আবার বলো, সিদ্ধিরস্তু— টানো। সিদ্ধিরস্তু, আর-এক টান ! সিদ্ধিরস্তু— জোরে ! নাঃ, কিছুই হল না। আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

সকলে। দুয়ো ! দুয়ো !

১ সৈনিক। যাক। আমাদের মান রক্ষা হল।

ধনপতি। নমস্কার, মহাকাল ! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি টলতে, আমারই ঘাড়ের উপরে টলে পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাঞ্চি। প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্রমেই বেড়ে উঠছিল সেটার বড়ো ক্ষতি হল।

ধনপতি। দেখো, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড়ো হয়েছি। আজ রথের সামনে এসে পড়ে আমাদের সংকট ঘটেছে— আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুনছি। এখন যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধরে আমরাই রথ চালাচ্ছি তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে বেশিক্ষণ টিঁকব না।

১ সৈনিক। যদি সেকাল থাকত তা হলে তোমার হাতে রথ চলল না বলে তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি। অর্থাৎ, তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। মাথা কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক। আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না ; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব হয়ে গেছে।

ধনপতি। সত্যি কথা বলি— যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢের বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই যে আমাদের মানতে বাধ্য হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী।

মন্ত্রী। ভাবছি সব-রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় তো আর বাকি নেই।

ধনপতি। ভাবনা কী। যখন তোমাদের কোনো উপায় খাটল না তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের করবেন। তাঁর চলবার গরজ তাঁরই, আমাদের নয়; তাঁর ডাক পড়লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আসবে। আজ যাদের দেখাই যাচ্ছে না, কাল তারা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সামলাই গে। এসো হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো একটু শক্ত করে বন্ধ করতে হবে।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। মন্ত্রীমশায়, আমাদের শূদ্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেছে।

মন্ত্রী। কেন কী হয়েছে।

চর। দলে দলে আসছে সব ছুটে। তারা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব।

সকলে। বলে কী। রশি ছুঁতেই দেব না।

চর। কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে।

সৈন্যদল। আমরা আছি।

চর। তোমরা কজনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে যাবে— তবু এত বাকি থাকবে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর। মন্ত্রীমশায়, তুমি যে একেবারে বসে পড়লে?

মন্ত্রী। ওরা দল বেঁধে আসছে বলে আমি ভয় করি নে।

চর। তবে?

মন্ত্রী। আমার মনে ভয় হচ্ছে ওরা পারবে।

সৈনিক দল। বল কী, মন্ত্রী-মহারাজ, ওরা পারবে মহাকালের রথ টানতে! শিলা জলে ভাসবে!

মন্ত্রী। দৈবাৎ যদি পারে তা হলে বিধাতার নূতন বিধি শুরু হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই তো বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিক দল। কী করতে চান, আমাদের কী করতে বলেন হুকুম করুন। আমরা কিছুই ভয় করি নে।

মন্ত্রী। সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা হয়। গোঁয়ার্তমি করে তলোয়ারের বেড়া তুলে দিয়েই মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর। তা, কী করতে হবে বলেন।

মন্ত্রী। ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্ছে সৎপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিনতে পারে। সেই চিনতে দিলেই আর রক্ষে নেই।

সৈনিক দল। তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি? ওরা আসুক?

চর। ওই যে এসে পড়েছে।

মন্ত্রী। তোমরা কিচ্ছু কোরো না। স্থির হয়ে থাকো।

শূদ্রদলের প্রবেশ

মন্ত্রী। (দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার! তোমাদের দেখে বড়ো খুশি হলুম।

দলপতি। মন্ত্রীমশায় আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি।

মন্ত্রী। চিরদিন তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে এসেছ, আমরা তো উপলক্ষ-মাত্র। সে কি আর জানি নে।

দলপতি। এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েছি, আমাদের দ'লে দিয়ে রথ চলে গেছে। এবার তো আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্ত্রী। সে তো দেখতে পাচ্ছি। আজ ভোরবেলায় তোমাদের পঞ্চাশজন চাকার সামনে ধুলোয় লুটোপুটি করলে— তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না, নড়ল না, ক্যাঁ কোঁ করে চীৎকার করে উঠল না— তাদের শুষ্কতা দেখেই তো ভয় পেয়েছি।

দলপতি। এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেন নি— তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।

পুরোহিত। সত্যি নাকি। কেমন করে জানলে।

দলপতি। কেমন করে জানা যায় সে তো কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোরবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বুড়ো জোয়ান সবাই বলছে 'বাবা ডেকেছেন'।

সৈনিক। রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি। না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত। দেখো বাবা, ভালো করে ভেবে দেখো, সমস্ত সংসার যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাদেরই 'পরে।

দলপতি। ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও।

পুরোহিত। তা দেখো, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা তো ব্রাহ্মণ বটে।

দলপতি। মন্ত্রীমশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও।

মন্ত্রী। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা কজনই বা আছি।

দলপতি। আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে কজনাই থাকো-না, থাকবে কী উপায়ে?

মন্ত্রী। হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা।

দলপতি। আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমরাই বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক। সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় করে বলে আসছিল 'তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক'। আজ এ কী রকমের সব উলটো বুলি। আর তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী। (সৈনিকের প্রতি) চুপ করো। (দলপতিকে) সর্দার, আমরা তো তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। মহাকালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝি নে, আমরা কি এত মূঢ়। তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর আমরা পাব।

দলপতি। আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে। মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী। কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। যে রাস্তায় বরাবর রথ চলেছে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি। রথের 'পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন, আমরা তো বাহন, আমরা কী বা বুঝি। আয় রে সবাই। ওই দেখছিস রথের চূড়ায় কেতনটা দুলে উঠেছে, স্বয়ং বাবার ইশারা। ভয় নেই, আয় সবাই।

পুরোহিত। ছুঁলে রে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ। হায়, হায়, কী সর্বনাশ!

পুরোহিত। চোখ বোজ্‌রে তোরা সব, সবাই চোখ বোজ্‌! ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক। ও কী ও! এ কি চাকারই শব্দ না কী? না আকাশ আর্তনাদ করে উঠল?

পুরোহিত। হতেই পারে না।

নাগরিক। ওই তো নড়ল যেন।

সৈনিক। ধুলো উড়েছে যে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেছে! পাপ! মহা-পাপ!

শূদ্রদল। জয়, জয় মহাকালের জয়!

পুরোহিত। তাই তো, এ কী কাণ্ড হল!

সৈনিক। ঠাকুর, হুকুম করো। আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথ চলা বন্ধ করে দিই।

পুরোহিত। হুকুম করতে তো সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছে করে জাত খোয়ান, আমাদের হুকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক। তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র!

পুরোহিত। আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র!

নাগরিকগণ। আমরা যাই সব নগর ছেড়ে! মন্ত্রীমশায়, তুমি কী করবে। কোথায় যাচ্ছ।

মন্ত্রী। আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক। ওদের সঙ্গে মিলবে?

মন্ত্রী। তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখছি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েছে। এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ কেউ মান রক্ষা করতে পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে।

সৈনিক। কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশি ধরা! ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চললুম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পুরোহিত। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগতে পারব।

মন্ত্রী। ঠেকাতে পারবে না। এবার দেখছি চাকার তলায় তোমাদেরই পড়তে হবে।

সৈনিক। তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যত-সব চণ্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ মাংস পাবে।

পুরোহিত। ওই দেখো, ওই দেখো মন্ত্রী! এরই মধ্যে রথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েছে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়বে কিছুই বলা যায় না।

সৈনিক। ওই-যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করে আমাদের ডাকছে। রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে চলেছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। চলো চলো, ওদের রক্ষা করি গে।

মন্ত্রী। নিজেদের রক্ষা করো, তার পরে অন্য কথা। আমার তো মনে হচ্ছে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে ঝুঁকেছে, ওর আর কিছু চিহ্ন বাকি থাকবে না। ওই দেখো।

সৈনিক। উপায়?

মন্ত্রী। ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরো-সে— তা হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান

সৈনিক। (পরস্পর) কী করবে। ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত। বীরগণ, তোমরা কী করবে।

সৈনিক। জানি নে, রশি ধরব না লড়াই করব! ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত। জানি নে, রশি ধরব না আবার শাস্ত্র আওড়াতে বসব!

১ সৈনিক। শুনতে পাচ্ছ— হুড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়ছে।

২ সৈনিক। চেয়ে দেখো, ওরা টানছে বলে মনেই হচ্ছে না। রথটাই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেছে।

৩ সৈনিক। পুরুতঠাকুর, দেখছ রথটা যেন বেঁচে উঠেছে। কী রকম হেঁকে চলেছে। এতবার রথযাত্রা দেখেছি, ওঁর এরকম সজীবমূর্তি কখনো দেখি নি। এতকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেছে। তাই আমাদের পথ মানছে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

২ সৈনিক। কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসব তো কোনো-দিন দেখি নি। ওই যে কবি আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করো-না, এ-সবের মানে কী।

পুরোহিত। আমরাই বুঝতে পারলুম না, কবি বুঝতে পারবে? ওরা তো কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা জানেই না।

১ সৈনিক। শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্‌কালে মরে গেছে ঠাকুর! তাই তোমাদের কথা তো আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা তাই শুনলে বিশ্বাস হয়।

কবির প্রবেশ

২ সৈনিক। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে-সব উলটো-পালটা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো?

কবি। পারি বৈকি।

১ সৈনিক। পুরুতের হাতে, রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী।

কবি। ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক। কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে। খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি। ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শুধু চলাকেই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর লেজ আছড়াচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরোহিত। আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে।

কবি। হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে। দেখো-না, কালই বলতে শুরু করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

পুরোহিত। তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের ডাক পড়বে।

কবি। ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর! মহাকাল বারেবারেই রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন। তারা কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পৌছতে পারে নি।

পুরোহিত। তারা চালাবে কিসের জোরে।

কবি। গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে— শাস্ত্রের কঠোর বা অস্ত্রের কঠোর— সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক। ওহে কবি, তুমি তো উপদেশ দিতে বসলে, ও দিকে যে আগুন লাগল।

কবি। যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে। যা থাকবার তা থাকবেই।

সৈনিক। তুমি কী করবে।

কবি। আমি গান গাব, 'ভয় নেই।'

সৈনিক। তাতে হবে কী।

কবি। যারা রথ টানছে তারা চলবার তাল পাবে। বেতালা টানটাই ভয়ংকর

সৈনিক। আমরা কী করব।

পুরোহিত। আমি কী করব।

কবি। তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তার পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।

—

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

২২॥১৩

গল্পগুচ্ছ

সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে ব্যয় করিতে জানিতেন তাহার অর্ধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। সুতরাং যে গৃহে জন্ম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

সুন্দর সুকুমারমূর্তি তরুণ যুবক, গানবাজনায় সিদ্ধহস্ত, কাজকর্মে নিরতিশয় অপটু; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জীবনযাত্রার পক্ষে জগন্নাথদেবের রথের মতো অচল; যেরূপ বিপুল আয়োজনে চলিতে পারেন সেরূপ আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সৌভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ হইতে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া শখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের সুন্দর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অনুচরশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি. এ. পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে এমন-কি নির্দিষ্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাৎ তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শুনিতে ও তাঁহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠাণ্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্র-দোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তর্জন করিয়া বলিলেন, "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছে, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।"

রাজা যুবতী স্ত্রীর ঈর্ষায় মনে মনে একটু খুশি হইতেন, হাসিতেন; ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত্র অনেক গুণী আছে, স্ত্রীলোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে

বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য। স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়, আর, স্বামীর আশ্রিতকে দূর করিয়া দিলে তাহার একমুষ্টি অন্ন জুটিবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্ত্রীলোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এইজন্য তিনি যখন-তখন বেশিমাত্রায় বিপিনের গুণগান করিয়া স্ত্রীকে খ্যাপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। অন্তঃপুরের বিমুখতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগৃহের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিকূল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন পুঁটেকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।"

সে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাবুর সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়।

রানী কহিলেন, "ইস্‌, বিপিনবাবু যে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পরদিন হইতে পুঁটে বিপিনের উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসময় তাহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভ্যস্ত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইরূপে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে সুভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্শালশেষে প্রস্তুত। রাজবাটির অঙ্গনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জুন। আহা, অর্জুনের যেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দর্শকগণ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনয় দেখিলে।"

রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অর্জুন সাজিয়াছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার সুরটিও তো দিব্য।"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা বুঝি কিছুই নয়, গলাটাও বুঝি মন্দ।"

রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া পুনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্বসিত ভাষায় রানীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন ; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইটুকুমাত্র প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে-পরিমাণে অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ৎকাল পূর্বে তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন ; হঠাৎ কী কারণে তাঁহার বিবেচনা-শক্তি বাড়িয়া উঠিল।

পরদিন হইতে বিপিনের আহারাদির সুব্যবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিপিনকে কাছারি ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, একসময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঃ!"

রানী অনুরোধ করিলেন, "খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন থিয়েটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হয় নাই বলিয়া রাজা পুঁটে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাবুর বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যায়।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাবু তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুঝি নিজে মাজিতে পারেন না।"

বিপিন পুনর্মূষিক হইয়া পড়িল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শুনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই পূর্ববৎ অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শয়ন ভোজন আরম্ভ করিলেন। গানবাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাহ্নে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল সকাল অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রানী কী একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাবুর একটা গানের খাতা আনাইয়া দুটো-একটা গানের কথা মুখস্থ করিয়া লইতেছি ; হঠাৎ তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শুনিবার জো নাই।" বহুপূর্বে শখটাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পরদিন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন ; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অন্নমুষ্টি জুটিবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দুঃখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে যে হঠাৎ রাজার হৃদ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন ; যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

আষাঢ় ১৩০৭

উদ্ধার

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে শ্বশুর শাশুড়ি স্ত্রীকে তাঁহার বাড়িতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ-একটু বয়স্থা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না এবং বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন ; ঘরে আত্মীয়স্বজন বড়ো কেহ ছিল না, একাকিনী স্ত্রীর জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষত অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহাকে পরেশ এক মুহূর্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক-এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ

নানাপ্রকার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে-সকল কথা গৌরীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙিয়া গেল, তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নিরুত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণকটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, ততই তাঁহার সংশয়মত্ততা আরো যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি-আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধুচরিত্র সম্বন্ধে দেশবিদেশে কাহারো মনে সংশয়মাত্র ছিল না। সকলে তাঁহাকে পূজা করিত। পরেশ ইঁহার সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্ষতের মতো ক্রমশ তাঁহার মর্মের নিকট পর্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্‌গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুশ্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলো দেখি, সেই বকধার্মিককে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।"

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো।" পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গৌরী কোনোমতে দ্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

গুরু কহিলেন, "এ কী।"

শিষ্য কহিল, "গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গুরুদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মুক্তদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

স্ত্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মুহূর্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গৌরী কহিল, "আমার খুশি।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুদ্ধ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে শহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্তব্য বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দূরে যাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইল, "বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে অনেক সাধ্বী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুষ্করিণীতীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গৌরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুন মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্বে চুল খুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হয়তো চিঠিখানি কখন বিছানায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাঁহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র -পাঠে ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছে মনে করিয়া গৌরী মনে মনে একপ্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতেছে, এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষুতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বদ্ধমুষ্টি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপ্লেক্সি— তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন মফস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদূর পতন হইয়াছিল যে, তিনি সেই সংবাদ লইয়া গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সদ্যবিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পুষ্করিণীর তটে দেখিল, তৎক্ষণাৎ বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল।

গুরু ডাকিলেন, "গৌরী।"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গুরুদেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন সৎকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রাবণ ১৩০৭

দুর্বুদ্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া, তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে

আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহিরবাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর।" দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী

নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।"

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, "ওহে আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই?"

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন-কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম,

আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে।

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্‌ণা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সংবরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ওই গ্রাম, ওই থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ওই কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলাতে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মানুষ না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আসুক।"

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

ভাদ্র ১৩০৭

ফেল

ল্যাজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারো মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, একবয়সি, এক ইস্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইস্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্‌ট্রান্‌স্ ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এন্‌ট্রান্‌স্ ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি বোতাম ঘড়ির-চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌মক্ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ

করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এন্ট্রান্স্ ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি বি. এ. পাসের একঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলার ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না; পাছে আরো ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারো ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, "যিনি যাই করুন, ফস্ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারো নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ ছড়্ শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল, কহিল, "বল কী হে।"

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, "খাসা মেয়ে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে।"

পারিষদ বলিল, "সে আর শক্তটা কী!" বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

হাজরা কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।"

নলিন কহিল, "সে ভালো কি এ ভালো।"

হাজরা বলিল, "এ-ই ভালো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরো একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাশে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শক্তটা কী।" বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরো একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভবিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, "বি. এ. পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা। এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাবু ফেল।"

অনতিকাল পরেই ননীগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ।

নলিন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির

বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, 'আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল। শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল।' ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, 'এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকে দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।'

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটোখাটো সমস্ত খুঁত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল, সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এত বড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, "দরোয়ান!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অব্‌হি ইস্‌কো কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।"

আশ্বিন ১৩০৭

শুভদৃষ্টি

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশুপক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মতো; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই-চারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অঘ্রানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি-বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরো গোটা-তিনচার নৌকায় চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রামবধূদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলায় তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ সযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দুই হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এইভাবে ত্রস্তসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনো নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনো আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোনার ফুলদানির চেয়ে গাছেই ফুলকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল

নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তরুণ পার্বতী কখনো কখনো এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদোকাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস-দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণসন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দূরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী একটা পাখি আহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কৌতুহলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থঘর, প্রাঙ্গণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে অঞ্চল ভিজাইয়া পাখির চঞ্চুপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ঘুঘুটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লুব্ধ জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি এক মুহূর্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ-আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্‌ ফিস্‌ কথার মতো নূতন উত্তরবাতাসের খস্‌ খস্‌ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুক-হস্তে হঠাৎ এই ব্যথিত বালিকার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম। পাখিটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই, কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তটুকু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সুধা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সুধা।" তখন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরমুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন নামটি উপযুক্ত বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটী জল পাইতে পারি কি।"

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটীতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সম্মুখে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার যদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবীন বাঁড়ুজ্যে কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সুধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভালো ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মতো সামর্থ্যও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে, তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুধার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ

এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছু একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে ?"

কান্তি কহিলেন, "আপনার যদি সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তুত আছি।"

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধাকে ?"— উত্তরে শুনিলেন, "হাঁ।"

নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখাশোনা—"

কান্তি যেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।"

নবীন গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সুধা বড়ো সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক। কখনো মুহূর্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।"

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপর-পরা চন্দনচর্চিত সুধাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্‌বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেয়ে নয়। হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল, মুহূর্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকারপ্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল! কত ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্‌-এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর-এক

মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নয়, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারো কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোশের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ওই রে, পাগলি আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মতো কৌতূহলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক-না, বসুক।"

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল। ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদুটি কত বড়ো হইল।"

অসংকোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহসপূর্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন, মেয়েটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী। সেদিন সে যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোনো সুখ ছিল না, শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা-অনুসারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত!

যতক্ষণ আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া ছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোনো-এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটিমাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল ; কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন, নবীনের আশীর্বাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১৩০৭

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপব্যাঙ-বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্ত সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছু সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর

পাত্র-সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি না থাক্‌, বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরিতে ৩,২৭৫৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, 'এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিবেন, আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।'

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এসো বাবা, এসো।" কিন্তু, কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়!

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।" ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "সে কি হয়!"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।" এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক -নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।" তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটো লোক নই। কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়াশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ-প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরো চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকতক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন, তাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরো সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটি সমুদ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।"

বরযাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।" বিদেশের বরযাত্রীগণ না

খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান ; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো ?"

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা তবে আনো" বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।"

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।" যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্ররা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।" বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারো ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল— বিভূতি কহিলেন, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।

উলুখড়ের বিপদ

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভালো। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, "বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না।" বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ-খরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে হরিহর দু-চারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারো খাতিরে কোনো কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদ্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধুলা লইল। দুই-চারি দিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুলিসের সমাগম হইল। গৃহিণীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্যমহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, "জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক, এখানে বড়ো মুশকিল দেখিতেছি।" হরিহর কহিলেন, "পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করো।" নায়েব ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া কহিল, "সামনের ওই জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহর কহিলেন, "সে কী কথা। ও যে আমার বহুকালের ব্রহ্মত্র।" হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিল, "বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিঁকিব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপালবাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসবসমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারম্বার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দিন কি কখনো রাত হইতে পারে। শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তবাবু, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্তবাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন, "সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।" ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, "হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "জজবাবু আপিলে

ফল পাইবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।”

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, “তবে আমার উপায় ?”

উকিল কহিলেন, “উপায় কিছুই দেখি না।”

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল, “প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।”

প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত ; কোনো বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কী ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না— পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছু গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোনো একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুল বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল, যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্বে কখনো হয় নাই, সুতরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হে, ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনো সন্ধান পাই নাই।"

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুরগি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে, প্রায় পনেরো-আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগায় কোথা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্য ঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।"

নবীন গম্ভীরমুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।"

পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জবানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।"

আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতির্বিদ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে। সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্বাণ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ওই চন্দ্রলোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে। তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না— একটা যে-কোনোপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।"

এ-সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আর্টিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আর্টিস্ট্ যাহাই বলুন, মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি তো দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল ; বাকি আরো অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এমনি খুশি হইলাম— নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম ; কহিলাম, "যত টাকা লাগে আমি দিব।" তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম, তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত, কাহারো কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত-আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্রান্ত করিয়া এই-সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগলামি মাত্র। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সহিত নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন

বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।" আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সঙ্গে যখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ো না। তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভয় করি না। বিধবাবিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"

আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?"

নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগুলি তো মন্দ হয় নাই।"

আমি মনে মনে কহিলাম, 'ধিক্।'

ধিক্ কাহাকে। তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে। কিন্তু ধিক্।

নষ্টনীড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরেজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরেজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু-কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, 'ভূপতি, তুমি একটা ইংরেজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যে রকম অসাধারণ' ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পুরাদমে ছুটাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অল্প বয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, "তাই তো, চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না— সমবয়সি স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।"

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড-ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিসতুতো ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বোঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাস হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না— একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারছি নে।"

চারু। হাঁ, তাই বৈকি! আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়— সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময়

কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চারু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল; দেখিল, থালায় একজোড়া নূতন-বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে। চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও স্নেহে শৌখিন অমলের শখ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদূর হইল।"

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, "কিছুই হয় নি।" কখনো বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্যই চারু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারো জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়া গাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সেকালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চারু কহিল, "আর ওই পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর-একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেকদিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চারু কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-পঁচিশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্‌টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল— চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্‌টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চারু কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাক্‌।"

মরিশস হইতে লবঙ্গ, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি

ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল ; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্‌টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এস্‌টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো ; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।"

চারু কহিল, "না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি করে তুলব। তিনি তো সাহেববাড়িতে ফরমাশ দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন — তা হলে আমাদের প্ল্যানের কী হবে।"

আমড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, "এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।"

চারু কহিল, "পাকা আমড়া খুঁজছি।"

লুব্ধা মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা-কিছু গুণ থাক্‌, কল্পনা ছিল না ; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া। সে এই দুই সভ্যের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জিত।

অসাধ্য বাগানের এস্‌টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কী ভাবে বাঁধাইতে হইবে, অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, "অমল, তুমি যদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চারু। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত—

আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আচ্ছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।"

চারু কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চারু কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি। মশারির চালে আবার কাজ!"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো-আনা লোকের যে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো-আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।"

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্‌, বউঠান।

চারু। না, আজই দেখাতে হবে— মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া, একটুখানি কাশিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল 'আমার খাতা'। অমল লিখিয়াছিল— 'হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনো তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব, সেদিন আজ কোথায়! তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।'— ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি আবার লিখতে পার না!"

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।"

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়— এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চারু কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নহে; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারো সাধ্য নহে। অমল নিজেই বারবার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চারু বলিত, "না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি; তুমি এইটে লিখে ফেলো, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা যায়।"

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, তুমি সেটা লিখলে না ?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একটু ভাবি।"

চারু রাগ করিয়া বলিত, "তবে যাও।"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটু-খানি বাহির করিত।

মুহূর্তে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ওই-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও।"

অমল বলিত, "এখনো শেষ হয় নি, আর-একটু লিখে শোনাব।"

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দুই-এক জায়গায় দুটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক চারুকে সদ্য সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর-সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল তখনই চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতরে আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনো প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত— চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চারু লক্ষও করিল না। অমল কহিল, "কী বোঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগণ্ড।"

চারু কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ; ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহুস্বরে জগৎ মাতায় না— তবু ভাই অশোক, তোমার ওই পুষ্পিত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়ো না; তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিয়ো না।"

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চারু কৌতূহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংসুটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।"

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না— পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোরুহ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খুব

খুশি হইবে। কিন্তু খুশির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বলিল, "সরোরুহ পত্রে যে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, একশো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চারু, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে 'অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারো অবজ্ঞার পাত্র নহে।'

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হাঁ— না ঠিক পড়ি নি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত

প'ড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এখনো বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না। দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।'

ভূপতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম— ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় বলে তো বোধ হয় না।"

চারু কহিল, "আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?"

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—"

চারু। ইস্ ইস্, তুমি আর বোলো না। স্বামী হয়েই রক্ষে নেই তো আরো কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসাবটা একটু রাখবে! এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে, এই লেখা পড়ে নবগোপালবাবু তাকে বাংলার রাস্কিন নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবর্মেণ্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে-ছিল— এমন সময় হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইরূপে শুরু হইয়াছে— 'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারা রাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল— আর আজ তাহার সেই ঢলঢল হাসিখানি— শিশুর স্বপ্নের মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চারু সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।"

চারু কহিল, "মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল, "এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তবু অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, 'বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।'

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইব্রেরি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরেজি প্রুফ-সংশোধন-কার্যে সাহায্য করিত; কোনো-একটা কাপির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত খুশি লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে— আমি কারো স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে— কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বোঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিয়া কহিল, "তাই তো বোঠান— আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরেজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয় ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান যদি আরো একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চারু বাংলা লেখার ভালোমন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।"

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার বউঠাকরুনকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কী দেবে শুনি।

ভূপতি। তোমার বউঠাকরুনের জুড়ি একটি খুঁজে-পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব।

দুটি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী-আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল

ও চারুর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমানুষি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোর দুটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইবে সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে। অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত, তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোনো ছলে

মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরটুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদুস্বরে বলিত "ঐ আসছেন" তখন অমলও বলিত, "তাই তো, জ্বালালে দেখছি।" পৃথিবীর অন্য-সকল সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখলে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শুনতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবত্তরঃ'।

চারুর ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মুখ্‌খু, তবু শুনলে কি একেবারেই বুঝতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিস্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, "তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসি গে।"

চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।" বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি।"

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছুই বুঝি নে; আমার

কেবল ঘুম পায়। বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, "তা বেশ তো মন্দা-বউঠান, তুমি শুনবে সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া পাত উলটাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরি থেকে পুরোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আজ নয়।

চারু। আজই তো। বেশ। ভুলে গেছ বুঝি।

অমল। ভুলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যাও ভাই, মান ভাঙাও গে; চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুশকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, পোড়ো না।" বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদৃষ্ট।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গল্প বলো, আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনো প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে, বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে, এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে।"

চারু কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি।"

চারু। এখন থাক্‌, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হুকুম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া

আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, 'সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।'

মন্দাও তো কম বেহায়া নয়। একলা অমলের সহিত একঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মতলব কেমন করিয়া বুঝাইবে। বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাঁহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চারু কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, যেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেই দিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার পূর্বের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না; চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী একটা লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চারুর কাছে সেইগুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!" হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে বলে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, "চমৎকার হয়েছে।"

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, "যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।"

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বৈকি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বারবার শপথ করিয়া কহিল "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল; খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না। তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল বুঝছ। দাদা মুখে যাই বলুন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চারু। তা হোক, আমার খুশিতে কাজ নেই।

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্‌ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুলিই ভালো, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা-ভঙ্গী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কী বল।"

অমল। অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কী করে।

চারু। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারো লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু কপি করে বের হবে; একটি তোমার জন্যে, একটি আমার জন্যে।

কিছুদিন পূর্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোনো রচনায় সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বেশ মজা হবে।"

চারু কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকরা যে মেরেই ফেলবে।

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, "কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ।" চারু কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয়দিনের দুঃখবিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চারু, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, পূর্বে এমন তো কোনো কথা ছিল না।"

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখ্খনো না।"

ভূপতি। বামালসুদ্ধ গ্রেফ্তার। প্রমাণ হাতে-হাতে। বলিয়া ভূপতি একখণ্ড

সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি।" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার ঢং' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ পড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইরূপ রচনাপ্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।"

চারু তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবার খুশি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল

আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতি নিভৃতে যে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড়ো রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল। চারুর ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চারুকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দপদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল। চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা।

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেলুম। আজ আমার কী ভাগ্যি।

অমল। আমার নূতন লেখা দু-একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই ভাই— আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে— আমার কী।

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত

ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল— 'অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহ-প্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই— নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ-জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার— যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎ-সংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এরূপ ভান করিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়। এ যেন মন্দার ঘরে। শরবিদ্ধের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনো চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল— 'মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনন্ত জগৎ-সংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই-তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্বোধ মূঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধে পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত

করিল। অমল মনে মনে কহিল, 'বউঠানের এ কী দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জুলুম।' এই ভাবিয়া সে আরো উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদুবাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন্ সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জানলার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না— মূর্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে

বুলাইতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ, চারু? মন্দা কোথায় গেল।"

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে— সেজন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না— একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, কী হয়েছে, চারু।"

কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছুই হয় নাই। অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না? এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্‌খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চারু, তোমার কী হয়েছে। আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমি কিরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেইজন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চারু, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।"

চারু অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জন্যে।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্‌, রাত্রে বলব।"

ভূপতি মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন থাক্‌।" বলিয়া আস্তে

আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, 'ফিরিয়া ডাকি।' কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রজ, ব্রজ।" ব্রজ চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলবাবুর খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রজ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে যে।" মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল, চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাচ্ছ না যে।"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চারু কহিল, "দেখো, কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঃ, তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলেমানুষ। সেদিনকার ছেলে—"

চারু। তুমি তো ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও। যাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন না খেলেন মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকরবাকরদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ তা বলতে হয়। চারু রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চারুর এ-সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও-না, চারু।"

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শুনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না— দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০৲ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব— তোমার সিকি পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।"

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে, সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পরদিনই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না— ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা-বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধুম যে?"

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অসুবিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে। বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লজ্জা। বাবু কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন, তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব সুস্পষ্ট— আর একদণ্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না— চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।" অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বুঝি আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে মনে ভাবিল, 'সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনোদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।'

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্রসম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ, এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বুঝি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু গুরুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমানুষি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশুনো করো, কাজকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্ষমুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্যপ্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে— অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই— তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর— ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না— পূর্ণিমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল— সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাথার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দুর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, "এসো এসো— আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন্‌ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোশ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল, 'আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।'

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্মী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু

যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অসুখ করেছে?"

অমলের স্নিগ্ধস্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, "কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরচ্ছে কি।"

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।"

চারু কহিল, "কই, তা তো কিছু বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল— কহিল, "আজ আমি 'অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিলুম; আর একটু হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।"

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল— কী বুঝিল, কী ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, "চারু, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনো অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদি বা হয়ে থাকে আমার তো একটা ছোটো-খাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।"

চারু। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম ? বকশিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে ? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত ?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চারু। অমল বিলেত যাবে ? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না ?

চারু। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না ?

চারু। আরো তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।"

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি থাকলেই উনি মত দেবেন। কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই। দাদার 'পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো?"

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে খিদে মুখে লাজ!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার খাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসা হয়।"

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বৈকি! কথ্‌খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ওই দেখো। নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও করতে পারব না।

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হাঁ।"

চারু। মেয়েটি ভালো কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চারু। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ওই নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু— দেরি হলে বুক ফেটে যাবে। তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়।

অমলকে চারু কোনো ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম না ধরছিলুম। হ্যাট কোট পরে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা, ভয় কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।"

ভূপতি খুশি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপুল নির্মম পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিনরাত্রি একান্ত মনে নিযুক্ত ছিল সেটা এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনে সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশু-সন্তানদের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল 'এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একটুখানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম,

আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র নাই।'

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্‌বেগ তপ্ত শূলের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল— 'অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তবু এ কয়দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।' চারু প্রতিক্ষণে মনে করে অমল আপনি আসিবে— তাহাদের এতদিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল,"আর একটু পরে যাচ্ছি।" চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে— চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল— নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দূর গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনই ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনো আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনো অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে— অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে— অনেক ভাব, আড়ি, অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য, অনেক বিশ্রব্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধুলায় লুটাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে। একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না— তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু

দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সম্বরণ করা আর যায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল— সে আশ্চর্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কী একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্যমুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা হাতে আহারস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চারু কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "যাও।"

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত— তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে— আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।"

চারু বলিল, "তা যাও-না।"

ভূপতি ভাবিল, চারু অভিমান করিল। বলিল, "তাই বলে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একটু জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্ত চিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।"

চারু তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ করিয়াছিল অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্তি একেবারে নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে, চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না— কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার

কেন। কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া— ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখদুর্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারো কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, 'চুলোয় যাক আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ।'

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে— সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তো, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, 'এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম— জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।'

ভূপতি মনে মনে কহিল, 'যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।' সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, 'বাস্‌, এখন আর-কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্তদিন খেলা করিতাম সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।'

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনো অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে। তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনো চারু আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, আজ যে এত দেরি করলে?"

চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।"

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোনো প্রশ্ন

করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ন হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিল, আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল— তবে কি চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুইজনের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুশি হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চারু, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল; চারু তৎকালোচিত একটা কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনো কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না— কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ।— চারু, ঘুমোচ্ছ?

চারু কহিল, "না।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল— দেখে এই বুড়োবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানায় অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল,

তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, অসুখ করেছে ?"

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশে বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল, চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিয়াছিলাম। চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালোবাসা সুগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না— ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনো প্রকার দুরাশা-দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়াশুনা ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো সুখ সব চেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, 'বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।' সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়— সে দুই-একটা কথা বলে, চারু দুই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে 'উঠিয়া যাই'— কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চারু, তাস খেলবে?" চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, আচ্ছা। বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়— সে খেলায় কোনো সুখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, মন্দাকে আনিয়া নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।"

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুশি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া

পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে। ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই ; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না। কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে।

চারু কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশুনো ! কিছু দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, 'আমি বড়ো নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।'

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বঙ্কিমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড়ো বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্তত করিল ; পরে কহিল, "একটা কিছু পড়ে শোনাব ?"

চারু কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা কিছু তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চারু কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে

লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরো দুই-একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে, ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-একসময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারো জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কেন। এত কষ্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে, তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটেমজুর-গুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।'

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল – নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল ; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল— সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল !" সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত, "অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, "অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।"

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারো কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধুলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া, চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্বে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন-কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।'

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।"

চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা।"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারো দেখি নি। 'বিশ্ববন্ধু'তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বলিয়া একখণ্ড 'সরোরুহ' বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, 'লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না;

রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।'

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধু নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমানুষি করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দায় ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ।"

চারু। এত চমৎকার হয়েছে— প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভয়ংকর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চারু সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে; সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল— প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয়দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে, চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, "ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও।" এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে, 'তোমার নামে চিঠি নাই' এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই— এ কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।'

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।"

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়— বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চারু। তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম, বড়ো জোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কী, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা।

চারু। তা হলে তো কথাই নেই।

দিন দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি?

চারু। না, অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হয়তো অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, 'আমি ভালো আছি।'

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।" অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তবু সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র— পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল— সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে-কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চারুর যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগুলা মনে আসিয়া তাহাকে 'মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়' বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাড়িতের মতো চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগুলো কোথায়।"

চারু কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগুলো দাও।"

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল, কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।"

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরিভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি

আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে, ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল— সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল— তাহার জন্য চারুর এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বঞ্চনা, এ তো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল, 'হায় অবলা, হায় দুঃখিনী। দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া, কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।'

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া— ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল! ওই একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের দ্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে— অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল— জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষদৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল— কিছু বলিল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত ব্যস্ত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধু। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না।

ভূপতি। মানুষের যা হোক একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে?"

ভূপতি কহিল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।— 'কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পলাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে

এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।"

চারু বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮

দর্পহরণ

কী করিয়া গল্প লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু এবং সার্ ওয়াল্‌টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনির্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনো মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে— অনেকে ইস্কুল-মাস্টারি মুন্‌সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন

অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্‌সেফি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ওই নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরো বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা— এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন— তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের শুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন-কি, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম— প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে, শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য, মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই— কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে

আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই— কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরেজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত— মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে কখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ। সুতরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারম্বার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুতো বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়োভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি

শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "খাসা হইয়াছে!" নববধূর যে রচনাশক্তি আছে এ কথা কাহারো অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না— কী জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরেজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্‌ ও কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্‌সের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন সময়

বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিদ্বান বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বুঝিয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুহুঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই— অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনো শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্‌ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা— আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্ত্রীর দন্তের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।"

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল, "কেন গো, এত ব্যস্ত কেন— আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।"

"তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে।"

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না, না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত— আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "ইংরেজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু— থাক্‌-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

> মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর,
> অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর— "

স্ত্রী কহিল, "আমি কিছুই মনে করি না— কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা

ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, 'আর সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন— কোনোদিন বা মশারির মধ্যে নাইটস্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।'

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা— এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।"

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্প শিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না— সেটার জন্য মাথা চাই।" মাথা যে কোথায় আছে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।"

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।"

আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার

ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না— যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনো দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম, বঙ্কিমের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়— তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল।"

যাহা হউক, ইংরেজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম— ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল, মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উদ্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উদ্দীপনা'য় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচীপত্র দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'ননদিনী', এবং তাহার রচয়িতার নাম— এ কী! এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারো নাম নির্ঝরিণী আছে কি। গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নির্ঝরের সেই হতভাগিনী জ্যাঠতুতো বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা— সাদা ভাষা, কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই 'নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায়।"

নির্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নির্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যিই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নির্ঝরিণী কহিল, "সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "অ্যাঁ, সে কী। কবে পুড়াইলে।"

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও এক ছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাশটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছি ছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনির্ঝরিনি দেবী

স্ত্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না— না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত— তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন— এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম। তিনি স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরো একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শুনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী

স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছিলেন— শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

ফাল্গুন ১৩০৯

মাল্যদান

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধূ করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী যতীন, পূর্বজন্মের কারো কথা ভাবিতেছ বুঝি।"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ওই-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সঙ্গে দুইবেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ

লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না - ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না— আমাদের ওই ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না ; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি— কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায়, সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদ্‌গদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, "থাক্‌ থাক্‌, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব— ধিক্‌কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটল। তবে এই কথা রহিল ?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।— বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই— একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য

দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ওই রকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না— অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল— কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল ; কহিল, "ও কুড়ানি।"

মেয়েটি কহিল, "কী, দিদি।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্‌ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না ?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি করিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না— ফাগুনচৈত্রে লগ্ন নাই— এখনো হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে— মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে— কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি— পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ওই মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্‌সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সংকোচ

করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে— এখনো শাঁসের রেখা মাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, "শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্‌ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আঃ পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উঁহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ওইজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে— ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কর্মই করো। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল— ওই বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্‌ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে, শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাবু ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তুমি যাও পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বৈকি। ছট্‌ফট্ কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচো। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে— তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে।"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—

তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম— হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে— আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধুলা নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধুলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও, তবে আমি খাইব না— আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত— এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল— সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, 'কেমন ধরা পড়িয়াছ।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময়

ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।' কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না।"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত-সংকুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— 'পালাইলাম। শ্রীযতীন।'

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ওই বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের

পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে— শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে— ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্।"

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে – সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারো হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুষ্টু; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।"

কিন্তু, কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ

করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল— এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারি-গাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি দেখিল। নাড়িতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ

হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল— কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি"— তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।"

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিনীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল

এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প্ ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল— ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে ?"

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা— নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্ রৌদ্রের আলোকে, কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না, তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশা আছে ?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাবু।"

যতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।"

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না ?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাবু।"

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল ; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন ?"

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমলদৃষ্টিতে কহিল, "না, দিদি।"

পটল কহিল, "যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে

এক একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, "যতীন।"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই— কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।"

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

চৈত্র ১৩০৯

কর্মফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসি সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন— সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল! দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কিরকম কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাকডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম

ধুতি পরে ইস্কুলে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেঁকে। তা, তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জানোই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন— মাগো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়— একে একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক সুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদুড়ি-সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে— আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধু।

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্; তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রীম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা। ওগো, যাও-না, ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন, আর আমরা কথা কইতেও পাব না!

শশধর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

সুকুমারী। এই যে মন্মথবাবু আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমানুষ, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

সুকুমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

বিধুমুখীর প্রস্থান

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। নিয়ে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়— সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা মাত্রই পায়, চাবার পূর্বেই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে সুখী হতে পারে না। বঞ্চিত হয়ে ধৈর্যরক্ষা করবার যে বিদ্যা, আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনই ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্‌বুদ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা যখন নেই তখন সাধুসংকল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উলটামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে— তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামত ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যার ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎপরামর্শ— গোঁয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত, পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেইজন্যই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা— প্রতিদিনই তো ঠেকছ, তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও, যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই— অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া— শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতি-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তবু তাহার আরম্ভও বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে— ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।"

বিধু কহিলেন, "পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।"

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, "সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন।"

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধু। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধু। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো। কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল, গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখেপড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।"

এ কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ স্বামীসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু

মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন, হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরালো না। রাত্রে কুলায় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্‌ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজবউয়ের কাছ হতে সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা।

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদুড়ি-সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো-না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বঁটি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প করতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ওই খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না।

বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদুড়ি-সাহেবের বাড়ি ইভ্‌নিং পার্টি ছিল, কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেস স্যুট পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্নিং স্যুট আর একটা লাউঞ্জ স্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভ্‌নিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কী, সতীশ। এ তো তিনশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ওই তোমাদের দোষ। এক, ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে

গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

সতীশের প্রস্থান

ভাদুড়ি-সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনোমতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদুড়ি-সাহেব ব্যারিস্টার মানুষ, বেশ দু-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিস্টার ভাদুড়ির বাড়িতে টেনিস-ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস সুট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না— আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন— ইনি আজ টেনিস সুট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি।

টেনিস স্যুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস স্যুটটা মিস্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই— এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী স্যুট সতীশ— খিচুড়ি স্যুটই বলা যাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি স্যুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ সতীশ। রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস স্যুট সম্বন্ধে তোমার যেরকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

অন্যত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুশকিল হয়েছে, আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থমনে থাকতে পারি নে— কেবলই মনে হয়, আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয়তো কুঁচকে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ওইরকম অনায়াসে স্ফূর্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে— দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শুরু হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা —

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো— টেনিস কোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ করেছ ; এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধু। বলো তো রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না।

মন্মথ। তুটো অপবাদ এক মুহূর্তেই। একজন বললেন নির্দয়, আর-একজন বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি— তাঁর ভগ্নী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ভগ্নীপতি পর্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কিরকম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলি নে। ফিরিঙ্গি পোশাক আমার তু-চক্ষের বিষ। ধুতি-চাদর চাপকান-চোগা পরুক, কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ বয়সে শখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়োবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরো বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো, যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখছি তার আক্রমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায়মশায়, পেরে উঠবেন না— দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাতুড়ি-সাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি করছে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও বেচারার বড়ো মুশকিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়িতে ওর জন্য—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা। এখনি নিয়ে যা।

বিধুর প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চলতে পারবে।

দ্রুত প্রস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে?

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক-না কেন, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

শশধরের প্রস্থান। বিধুমুখীর ক্রন্দন

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনো কান্না, কখনো হাসি— কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই— বেশ আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস

ও মেজবউ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি, রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমার মেজাজ কি এতই বদ।

নলিনী। না, ও-সব কথা থাক্। সকল সময়েই নন্দী-সাহেবের চেলাগিরি

কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামী জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাঁকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি যখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামী ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামী একটা নেক্‌লেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাতজন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু এ নেক্‌লেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামী জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস।

সতীশ। এ নেক্‌লেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী-সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম— এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ওই নেক্‌লেসটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে।

সতীশ। সে কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেকদিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামী জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফুলের তোড়ার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী-সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা, আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ওই ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটি মন্দ হয় নি। আজকের মতো ওইটুকুই থাক্, বাকিটুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁঝাঁ করতে শুরু হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি, এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বলেছি, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো, এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তার চলে কী করে বলো দেখি।

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না— ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে।

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

মন্মথর প্রস্থান। শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কী।

বিধু। সবই তো শুনেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন সুস্থির হচ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর যাই বল মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে। কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই— সতীশের ধার শুধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস। আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্‌দিন কী করে বসে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্‌ এমন কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে

পড়বে। একে এক্‌জামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি, সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি নাহয় ওকেই মানুষ করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন, বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্‌, তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না। আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারো উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল কর্মফল করো আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহ্‌কুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শুধতে শুধতে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরকম। কর্মফল নৈসর্গিক, মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুশি করবেন, আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, তুমি কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংযম আর-এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝতে না দাও, তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ করো— দুই নৌকোয় পা দিয়েই তার বিপদ ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ মন্মথ— তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস -মতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি তা কোনোমতেই হবার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না। অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাদুড়িজায়া। শুনেছ? সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিস্টার ভাদুড়ি। হাঁ, সে তো শুনেছি।

জায়া। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদুড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না! তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদুড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসেছিলে। অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। যিনি যাই বলুন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

ভাদুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল— অগাধ টাকা— ছেলেপুলে কিছুই নেই— বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্‌ নিক-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

ভাদুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না— পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ওই দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল, অমনি তখনি উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ওই স্বভাব সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেকদিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন না— বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয়-বা, সতীশ।

সতীশ। অ্যাঁ! বলো কী মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুলও তো হয়।

বিধু। না, ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই— ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বিধু। সতীশ, তুই চাকরির চেষ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস

আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, যাই বল মা, এ ভারি অন্যায়। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় তো কী, সতীশ। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার। শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেল। অস্থির হোস নে সতীশ। একমনে ভগবানকে ডাক— তাঁর কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো— এখনো সময় আছে। মা, এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু যেরকম অন্যায় হল, সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে— তিনি দয়া করে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপায় কী হবে সতীশ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্‌ফাট্‌ সাজ করে কোথায় চলেছিস। উঁচু কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেঁট করবি কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম, কথাবার্তা পরে হবে।

প্রস্থান

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি। মাগো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক, শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই, এ আমি বরাবর দেখে আসছি। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি— আমি তো সতী স্ত্রী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে দিদির এবারে—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। সতীশ।

সতীশ। কী মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি।

সতীশ। অপমান কিসের মাসিমা। কাল ভাদুড়ি-সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়ি-সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলেম, তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তবু বুঝি ওই রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে। তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে। কিন্তু, সরকারও তো ভালো— সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় দোষ হল, তবু যে কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ, দরকার-মত দুটো কাজই না হয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না। কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

সুকুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই— আর একটা সেলার সুট—

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো, জুতো চাই।

সতীশ প্রস্থানোন্মুখ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন— সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি ভাদুড়ি-সাহেবের রুটি বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। খোকার জন্যে স্ট্র-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম, তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নূতন স্যুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুড়ি-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না যেন।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ওইজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে— পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন — মনে আছে তো ? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্‌ গে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা,

ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাস বুঝি! আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী দাদা। এ যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ— তাই বৈকি, আর-একজনের জিনিস বৈকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

স্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে

ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা সয়ে আকার সা ভালোবাসা।

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস নে— ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলছি, যা।

হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।

হরেনের ক্রন্দন

এমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখনই সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে দোকান ঝাঁটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। যেন নবাবপুত্র। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর্ বলছি। ওই হামদোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম, আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল— তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে— তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেছে।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-ক'বরাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়। যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প।

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দী-সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির কোরো না। ওই বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন, আমি যাই।

প্রস্থান

সতীশ। মিস্টার ভাদুড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি।

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়ি নি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি, ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে। সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিসটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ওই দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না— ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়— সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন

কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়ি ভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েছে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষ্যান্ন বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না।

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না, দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই! তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ওই কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি— অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে— কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি নে— এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে, তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে।

কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল— সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা হতে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই— এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ।

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক, তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো—কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত

শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো— তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশু শুক্রবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্। ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বুঝি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই— যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন— তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন।

সতীশের প্রস্থান

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি সতীশকে আমাদের তরফ-মানিকপুর লিখেপড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুগ্ধ। না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না।

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে— তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব— এই আমি বলে গেলুম।

সুকুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না।

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না, তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো ?

শশধর। না, সে তিনি— অর্থাৎ সে একরকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি! বিলক্ষণ। তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন ?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদ্‌গার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁপ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ— তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত— তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল! সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। চাকরি হয়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ যে একতাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই, মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুন্‌চট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি— ইতিমধ্যে দর চড়েছে ; তাই মুনফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা।

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ— আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্চির হাতে দাও-না— ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো ?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আবার নূতন করে ফাঁদতে পারব না।

প্রস্থান

সুকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কিনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল পূরণ করে রাখব— কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই যথেষ্ট। নেলি— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি-বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল। আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব।

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল তা আমাকে তখন বলে নি— তা হোক, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি স্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব— মৃত্যুর দ্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব— এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে চাই। পৃথিবী হতে ওই ধুলোটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন— আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু, আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল— অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য, অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না— সেজন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল সুখকে কানা করে দেয়। তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ

জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না। আঃ— তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁতমাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না— অথচ আমার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল— আমার নেলি - উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে! বাপ-মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাঙ্ক্ষা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উর্ধ্বে চড়ে নি— ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কী মূল্য। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কী এমন বড়ো। এখনি যদি ছিন্ন করা যায় তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা— ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পাচ্ছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশায়— এইবেলা রক্ষা করো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি মা— কিছুই না— দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ মদ ধরেছে বুঝি!

সতীশ। পালাও— তোমাদের ছেলেকে নিয়ে এখনি পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্‌ দেখি। আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে থানাতল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এই বেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই— পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে!

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়— যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শুনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী। এখন আর কাঁদতে হবে না— যাও যাও, আমার সম্মুখ হতে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ওই পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না— মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি— এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ— আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো, আমি সব যেন সহ্য করতে পারি— আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ, সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কী আর বলব। মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি— ভগবান তোর ভালো করুন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিই গে।

প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটা হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি— কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না— তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী— আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ওইজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা, ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি— এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদিগকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই-যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না— তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

পৌষ ১৩১০

মাস্টারমশায়

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা

থানা হইয়া গেছে। সেই থানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাতলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকাগাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী! এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল – কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল— এ কী ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল। "এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।" সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি জায়েগা!" শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল— ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া দুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয় তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক

করিতে লাগিল যে, কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacuum— তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না— পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল, সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না— সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল— তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়্‌খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না— কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা-ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো— যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক।" অধরবাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার-খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে

তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে, কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই— সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল— সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল— সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত

করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ চড়িল— সে কহিল, "নেহি জায়গা!" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কী পর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল— কাহাকেও পছন্দ হইল না — আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্‌ট্রেন্স্‌-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন।"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না— এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে— নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে— বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই— কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে

হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টার-মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়স সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে

একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাথামাথি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন-চার জন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরের ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে— ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্ছায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া

আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন— ভালো করিয়া খাইতেছিস না— ব্যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না— ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও

বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়— নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না— অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁটরাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন।" বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দু চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের

পেঁটরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না, অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো'— এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে— কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল— বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোঁক পাড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরো কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়োসাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন, এ লোকটা চলিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না"। "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুশি হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা

বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি— আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর

অশৌচের সময় পার হইয়া গেল— তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী-যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না— লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল 'মাস্টারমশায় আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই-বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব ; তাহার পরে ভাবিল, বলিয়া লাভ কী— বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন— আহা, বাছার মা মারা গেছে।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার

কেবলই মনে হইতে লাগিল, আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, 'বাস্‌, এই পর্যন্ত। আর কখনো ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে— কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।" বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে-ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়— তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত। হরলাল ভাবিল, আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই— আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখহাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা

ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।" বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময় হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা।"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।" এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্‌। ওঠ্‌।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে

হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন— হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন— সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি, তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর-সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে।

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে?"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ— আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম ; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিরা খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনোদিন

সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল— বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল— চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই— টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস ?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে।"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার

সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল— দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল— তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, 'বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন, তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম, কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস— এ আমারই জিনিস।' এ ছাড়া আরো অনেক কথা— সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না।

তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল— কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল— গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন— ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উলটাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি। বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি

ঘড়ি বোতাম হার নহে— ব্রেস্‌লেট চিক সিঁথি মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ওই-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না— সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব; হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন, ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো। জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ— মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে ?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই— তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে ?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি

ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না— তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম— আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি— আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি।"

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।"

হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরো একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী— এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারো মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে ; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না ; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে ; ঠিকাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে ; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"— যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই ; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো

আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল— যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে— কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ওই একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে— মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে— তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না— মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে— বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল— হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল— ওই গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল— এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না— কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪

গুপ্তধন

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর-কিছুই নাই ; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন সে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক, বাবা।"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল— কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন— কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্তদিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী 'জয় হোক, বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কী চাও," হরিহর কহিল, "বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি

মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা ; আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরম্ভটা এইরূপ :

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না-কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পারো।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল। সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল— গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ওই কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না— সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী।

তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওই-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ওই বন শহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ওই বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল, আর ওই বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল— কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল— 'শেষে দিল রা', অতএব হইল 'ধারা'— 'পাগোল ছাড়ো পা'— 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল— অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'— এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে

একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিমপাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল-বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে।

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুলি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা-রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্টসিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে— কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর

প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না ; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উলটা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল, সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে— মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার

হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই— কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চকমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে

সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাতেই পারি নাই— পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ওই লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ওই গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িয়া গেছি। এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো— আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব— কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না, কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে— এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন— এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি— এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি —এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি।

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, "দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ওই লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ওই কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল— সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার

চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই— আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল— সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব-পরিচিত।

"এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম। সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরো বাড়িয়া চলিল— উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে

পারিতে না ; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর-এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই— আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ওই-যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না— আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি– কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছু চাই না— আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কী নিষ্ঠুর।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার-খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চকমকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন, এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, "এ সোনা আমার— এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল— আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড়ো এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপর ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।— তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত

দক্ষিণহস্তের উপর একরাশি পিতলকাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি বাহিরে যাইতে চাই— কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন— পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না— সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না— এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল— তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না। এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ওই সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই— মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার

পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই-যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষী লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামাজননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১৪

রাসমণির ছেলে

১

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন-কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনি ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন-কি, ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, 'বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কী।' শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের 'পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মতো থাকিয়া দাদার

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না— কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না কারণ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন— তাহার যে কোনো-একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি। আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী। দেশসুদ্ধ লোক জানে, পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তো এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔদার্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন, তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কী কথা। আলন্দি তালুক তো আমার খোরপোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম— তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ওই তালুক ছাড়া আর-কিছু দেন নাই।"

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল না-ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য— সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল, কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা

ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

২

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মতো বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, 'ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।' ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'আমি আইন-আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে!'

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাসবাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিস। সতীসাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই-যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই-যে পূর্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দুদিনের একটা অভিনয়-মাত্র— এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল। অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, ইহারা জানে না এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য— তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কতবার পুজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু-ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-

কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয়পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্‌বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শখ ছিল— বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বর্গীয় কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে! আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদার লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না', ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের

বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্‌বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন— ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব-বংশে তাঁহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধুরীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন— বলিতেন, 'আমি গরিবের মেয়ে, মানসম্ভ্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।' উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই-একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনো তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারের সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে— সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে— এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি

করাইয়া লওয়া— তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়— চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে— তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে, অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর— অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহ্মত্র অল্পসল্প যা-কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহসিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনোদিন ছিল না— ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উলটা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমানুষিয়ানার কিছুই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে সে বিষয়ে স্ত্রীকে

অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই— এই তাঁহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন, এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বড়োমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে— ওর তো উপায় নাই। এইজন্য তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাব সত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না— হয়তো বলিতেন, 'ওই রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!' বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্‌কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন— ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত— ভবানীচরণ অম্লানমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর— তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই— রাসমণি

নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন— নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুশি আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান— তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক— অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়।

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্ত যে সস্তা কাপড়জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানে না— তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক। কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতিবৎসর

পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মূর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনি উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইয়াছ!"

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার তো প্রয়োজন নাই।"

রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জানে!"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত— কিন্তু সে দিকে ভারি কড়াক্কড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না— কিন্তু বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্তিটি ভবানীচরণের দই-পায়স-ঘি-লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ওই একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, "সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই— তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অল্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।" ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, "রোস— এখনি কী। সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক।"

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কী একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, “বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কী যেন ভাবে।”

রাসমণি কহিলেন, “ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুষ্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।”

দুর্গপ্রাচীরের এদিকটাতেও কোনো দুর্বলতা দেখা গেল না— পাথরের উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, “ক্ষুধা একেবারেই নাই।”

এবার দুর্গপ্রাচীরে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন, “ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অর্ধেক চুরি করা হয় তা জান!”

কালীপদ নাকীসুরে কহিল, “আমি কী জানি। বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।”

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই— তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন— কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন এক মুহূর্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন— কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।" এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, আমার সেই মেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "রোস বাবা, আমার একটা কাজ আছে— সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।" বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার করুণসুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়— প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।"

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কী একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনি বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি-পায়সের সদ্‌গতি হইবে না, এমন-কি, মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন

তখনি এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনি এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমমূর্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ রান্নাটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কী চমৎকার জমিয়াছে সে আর কী বলিব।"

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা খাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একঘেয়ে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত— কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুই টাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সসমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেকদিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল; তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা বাবা, কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।"

কালীপদ কহিল, "আমার জন্যে কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব— এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।" কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারো মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড়ো করিয়া দেখিলেন— সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়— ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন ; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন— এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে। সংসারখরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান

করিয়া গ্রহণ করিল— এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

৩

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই— এমন-কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পুল বাঁধা হইতেছে, এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। "শুনেছ ভায়া, গঙ্গার উপর আর-একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে— আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে"— বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানা অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। "দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুরশেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গঙ্গা যখনি যাইবার উপক্রম করিবেন তখনি সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল— সেই সাহসে এখন হইতে মন

খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। সুতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনি হউক, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমানুষের ছেলে ; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক— তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ-জাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাসে কিন্তু আত্মীয়দের মুশকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয় ; কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয় ; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো

লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতিঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামী খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী শৌখিন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, "তোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব চেয়ে শৌখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁতসেঁতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন

বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁষে নাই— এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা এক মুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যখনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো, এবং সে দুই সন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই-একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দুই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই মুখচোরা মানুষের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ ; এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপধাপ শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন-চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা

কলিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই, এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার একপাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতা-মেরামতওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্‌টা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।" "এই যে, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্‌ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া

ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারো নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এ পর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়।'

সরস্বতীপুজা ধুম করিয়া হইল— কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত— সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও বিনা ভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়নাকোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্ত পুঁটুলি -সমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ওই পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার

কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত— কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন ; যে আধারে সেগুলি রক্ষিত সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসজ্জার কোনো লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে— কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগুলিকে তক্তাপোশের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচ-মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, "ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে— সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে— একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই— পাছে ওই পাবনার ছিটের চায়নাকোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ওই একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ওই লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বদ্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, "এবারে কালীপদ কোন্‌ সাতরাজার-ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির করো।" এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা— তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে— প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জনদুই-তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোশের নীচে হইতে আচার চাটনি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিংসমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই

চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড়, বই, খাতা, কাঁচি, ছুরি, কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্যে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কিরকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলটপালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলায়

দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপন কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি —জীবনের কত মুহূর্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিন-কার মতো এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহত্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে, এই নোট-খানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্র-মন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকে কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে, এও সেইরকম।

উপরের তলার অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়; এক মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহ-বা চৌকিতে, কেহ-বা বেতের মোড়ায় বসিয়া হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন, আমার নোট দিন।"

যদি সে মিনতির স্বরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, "কী বলেন মশায়। কিসের নোট।"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।"

"এতবড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মতো গুমরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই— সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা একশো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক— আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্‌ন অ্যাপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারো বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল। ভাবিল হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাবু।" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই

বিড়্‌বিড়্‌ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।"— কেহ কেহ পরামর্শ দিল, "পুলিস ডাকিয়া আনো— কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে— কাল যেরকম কাণ্ড দেখিয়াছি— সাহস হয় না।"

শৈলেন কহিল, "না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।"

অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তক্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে— তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুটো খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার কোনো ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট

হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত— প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিযত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি— আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল, তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য-সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন— শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরমস্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, 'ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস— আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।' তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সে'ও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন কি, পিতামহী

তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না— কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভরতি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিযত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।" চৌধুরীবাড়ির বধূর পক্ষে হটহট করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই ; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল— ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জ্বর পূর্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বলিবে। বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী।

জ্বর কিছু কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্‌ ঘর। মনে হইল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি।

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সংকট উপস্থিত হইবে সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন।"

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই

যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধুর মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশিই হইত— কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শৌখিন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত— তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁতসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকের ঐশ্বর্য-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ওই সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না— আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল— ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাশা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুনদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুনদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে এ কথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল— এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুক-পরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্‌ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান

ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো 'কিন্তু' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্যের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল, তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন, তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লুটিয়াছিলেন— সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই-সমস্ত সুখস্মৃতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনোই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগলামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগলামিকে আপসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিন্তু এরূপ তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সে'ও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন— কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারো কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন— তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, "তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমারই ছেলেরই মতো, তারা তো

তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে— ইহাই কি কম সুখের কথা।" শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল— একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত— এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত, কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ ফসকাইয়া গিয়াছে, আর তো সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল— এ সম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, "বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।"

শৈলেনও বলিল, "এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর আমরা তো আছি।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকরুনদিদি যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।"

শৈলেন হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকরুনদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতায় নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরযত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম ; কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, তোমারও কষ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকুরুনদিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক, একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল ; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল— সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না— তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— স্বামীর মধ্যে আবার দুজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, আর আমার সয় না। তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে 'দয়াময় হরি' বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড রয়াল রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর— হায় হায়— তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল— জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ওই ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল— যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে— তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নলালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময় পূজার সময় কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের

দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল। বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে— ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্‌বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে – তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালী-পদরই মতো হইবে। "এসেছিস বাপ" বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙাগলায় একবার "কালীপদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারো সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী ও।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।"

রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।"

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।" বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?"

রামচরণ মুদি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল— আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী একটা দেখিয়াছিলাম।"

'আরে দূর' বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

আশ্বিন ১৩১৮

পণরক্ষা

১

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে বোলো বছরের ছোটো। মাঝে যে কয়টি ভাইবোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যাবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না— ঠুক্‌ঠাক্‌ ঠুক্‌ঠাক্‌ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে— কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় শৌখিন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সেজন্ত তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড়ো বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্তই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পুজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর-আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা-কিছু প্রয়োজন ছিল না, তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলংকার-বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার— এখনো অন্তত চার-পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠীতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে —সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের শৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই, সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্ত তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা; এমন-কি,তাহাদের

অভিভাবকেরা পর্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না— তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল ; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না— রসিক তখন চাপকান-জোব্বা-পরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স-হার্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়— এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যনূতন শখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধূ কেবলই দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পুরিল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বর-প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা— এমন কত নাম করিব— সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড়ো শান্ত— সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, 'সৈরি, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্‌'—

তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুশি লইতে পারিত, কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না ; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুলগড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত— রসিক তাহাদের সকলকেই হুংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না— সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, 'আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্'। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনোদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতনগোছের যাহা-কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়ো— পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

২

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার

জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়; বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিটমিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময় বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দি, আর একটু হাতে টাকা জমুক, আসছে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভর্ৎসনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এতবড়ো অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আম-বাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক

আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে— গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল— রসিক তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরো বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা তো ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না ; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফল তো দেখা গেল না। 'দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!' সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না— সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে তো ঘুচিয়াই গেল— তার পর সর্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার

উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুশি কখনো-বা একলা কখনো-বা দলবলে কিছু-না-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহুদূরের জন্য তাহার চিত্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল— বংশী তাহাকে খুব বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ওই একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল ; এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

৩

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্‌ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু কী চমৎকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মতো মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত, এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্‌ল্‌ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কী বেশি। একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে— ইহা তো সস্তা। বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্যের অরুণসারথি তো সৃষ্টিকর্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল— কিন্তু এই বাইসিক্‌ল্‌টি আপন পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছু বেশ-পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, 'দূর হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না— দিয়া ফেলি।' কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে। একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।" রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।" বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, 'থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না'— বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারা প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর-বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার

সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মোনিয়ম-যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত, আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল, একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই, তোমার সামর্থ্য যতদূর ঢের দেখিয়াছি! শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল— এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে 'দাদা' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য-সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত, সে-সমস্তই

সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-কয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল; রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, "এই নে ভাই— আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শক্তি নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর যা খুশি তাই করিস।" রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোর-স্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না— কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

৪

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এতবড়ো একটা ভয়ংকর আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপনার মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময়ে একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি?"

হার্মোনিয়ম! এতবড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে, বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার

শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল, "ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।"

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, "সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন্ তো।"

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে, তাহার সময় নাই।" রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, "চল্ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে।" রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর-কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস সৈরি ?" সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নকশা ছিল— কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত— সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল— এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই-তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না ?"

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল যে দেখাইবে কেমন করিয়া।

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময়

লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল— সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল "সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম," তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে, দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই ভাব করিয়া লইল— কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইবে"— বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না— রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।" স্ত্রীলোকটি বলিল, রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না— অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে— কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি, এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গোরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না,

কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। 'উপার্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই', যেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্‌লে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না— রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট, এখানকার সুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্গুন মাসে সরষে খেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব, এখানকার আমোদ-উৎসব— এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

৫

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে— যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়— তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনই সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে; কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা -নামক পদার্থটাকে খুব করিয়া দৌড় করানো যায়, সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে; কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মতো দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অরুচিকর জিনিস আর-কিছুই হইতে

পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে; মুহূর্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে— দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে, দাদা কাছে নাই এবং সেইসঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনি সেই অর্ধরাত্রে সে মনে করে, কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, 'আমি পণের টাকা ভরতি করিয়া বাইসিক্‌লে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষমানুষ, তবে আমার নাম রসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালাবাটি, নিজের যে-কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত-দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা— নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন— আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এতবড়ো মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও রসিকের জন্য একমুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্‌বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল —বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দুর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে

বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা— দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে— কিন্তু মুটেমজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই— সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল, যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান।" 'আমি তাঁতি' আগে হইলে রসিক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না— তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ তো লাফাইয়া উঠিল— বলিল, "তুমি তাঁতি! আমি তো তাঁতি খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিকল্‌-চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে। তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা

প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধপাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথগাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মতো প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে শুব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের-খুঁটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-স্নিগ্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী, এই-সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলে কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মতো মরণের পথে টানিয়াছিল— কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এইজন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত খাই-খাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোর বর আসিয়াছে' বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে— রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলই বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না— এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

৬

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি-বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি-বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না; কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিশন এজেন্সির মস্ত কারবার— সেই কারবারে কেন যে জানকীবাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি-বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে, অতএব জানকীবাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া

খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর-কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য— তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে— তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যাবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরানীর মতো তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবিল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অল্পবয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই-একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে— কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের

বসাক-বংশের ছেলে— তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির পড়াশুনা কিরকম।" জানকীবাবু বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি, তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত।" গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "টাকাকড়ি?" জানকীবাবু বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।" জানকীবাবু কহিলেন, "পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে— এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কী উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?" রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্‌ল্ দাবি করিল।

৭

তখন মাঘের শেষ। সরষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলা-ভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে— নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙিন ফুলমোজা ও চকচকে

কালো চামড়ার শৌখিন বিলাতি জুতা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল— ছেলেরা সেই দিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বেই বাইসিক্‌ল্ রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে— কেহ নাই, কেহ নাই। এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সামনে যাহা-কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিগরগাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুরগাছ— সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রসিক পাংশুমুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নিচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি, বুঝেছি— দাদা নাই।" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক তাহার দুই হাত ছাড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সামনে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহূর্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া

রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্‌। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুকফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্‌ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার এক মুহূর্ত আর-কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো— এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো— দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল— বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে— কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পৌষ ১৩১৮

প্রবন্ধ

পারস্যে

পারস্যে

১

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরানী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কনসাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হল। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না বলে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হল। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী। এক বায়ুযানে চারজনের জায়গা হবে না বলে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্বে আর-একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছুডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

২

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপরিগাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা-ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। কোথাও-বা দাগ-ধরা পুরোনো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ; শিবমন্দির জনশূন্য;

এবড়ো-খেবড়ো পোড়ো জমি; পানাপুকুর; ঝোপঝাড়। পাখিদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোর-বেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস-থানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড়ো রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল-বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লবস্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত; সেই যে কালে শতাব্দীপর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গনপার্শ্বে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দগম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্তসংকুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধুলোর ভাষায় রাষ্ট্রপরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতি উট তাঞ্জাম ঘোড়সওয়ারদের অলংকৃত ঘোড়া; রাজপ্রতাপের সেই-সব বিচিত্র বাহন ধুলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকি আছে সর্বজনের ভারবাহিনী করুণ-মন্থর গোরুর গাড়ি।

দমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা ওই দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধুবান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দোলা-ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানাপুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্মল নিরাময় জলগণ্ডুষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর-কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে; তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানলা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চার দিক ধূ ধূ করছে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শংকরাচার্যের মোহমুদ্গারের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্ধ্ব থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ্-বিভাগের ভিতটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নীচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন; ক্ষণে ক্ষণে চলছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল। কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন করে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকি তিনজন পালাক্রমে

তরী-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু-বা আহার, কিছু-বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে ঊর্ধ্বতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরী টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত করে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবাভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্নে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্রপাখির হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনি নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরের তখন প্রাণধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্‌বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরীযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যতরকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত।

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হল। হাওয়ার গতিক পূর্ব-দিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়্‌ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার সাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না শুনি গর্জন, না দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্নর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী

জাস্কে পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপটা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পদ কিছুই নেই। সেইজন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরিব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান করে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়া ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন করে ধরলে।

এখানকার রাজকর্মচারীর দল সম্মানসম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েছে। যে দুই-একজন ইংরেজি জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ করে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানবসম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে – অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম-প্রচারক, কোরানপাঠক, সৈয়দ— এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সংকুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস করে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি-অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার

পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে। লেখক বলেন :

Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা করে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক বলে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি— কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরো অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্ছে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যার পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তা হলে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন-কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে; যদি অন্যের জন্য হয় তা হলে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মকে যদি জীবিকা, এমন-কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্তব্য এ কথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে-রাত্রে উঠতে হল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই এপ্রেল তারিখে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল।

বুশেয়ারের গবর্নর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হল, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর-রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম; মনে হত দরকার আছে বলে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার করে চলেছে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্যে। নৌকোর পালটাকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ

রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েছে সুন্দর। পাখির পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল করে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্যও কত। এই তো হল প্রাণীর কথা তার পরে মেঘের লীলা— সূর্যের আলো থেকে কত রকম রঙ ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর! / মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভারের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে সে হচ্ছে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল করে নয়, বাতাসকে পীড়িত করে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখির গান নেই, জন্তুর গর্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় করে আজ চিৎকার করছে।

সূর্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টামাত্র করে নি। আকাশনীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেন্টের বালাই নেই; শোভাকে ও অবজ্ঞা করে; অনাবশ্যককে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল, পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ওই যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মতো ভন্ ভন্ করে উড়ে চলল।

বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব তা হয়ে এল দুই আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত

জম্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ— অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্‌ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের, সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক :

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক দেশকে দেখে। এইজন্যে বায়ুতরী যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটছে তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোটো হয়ে গেছে বলেই সময়-পরিমাণও আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্ছে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাত। জগতের এই যন্ত্র পরিমাপ যদি আমাদের জীবনের সহজ পরিমাপ হত তা হলে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দুনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর-এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না বলে তারা আমাদের অগোচর। কী করে বলব এই মুহূর্তেই আমাদের চার দিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিভিন্ন বিশ্বের বাণী একসঙ্গে উদ্ভূত হচ্ছে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য এ যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে— সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্তের দুষ্মন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন— আমারও সেই দশা। এ কালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর— সেটাই সব-চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তুলতে হচ্ছে, তবু এরা পরাভব মানছে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরীর চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্তিমান উদ্যম। যে আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূতবলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্‌বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল

রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। মনে প্রাণে সাধনা করে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি, কিন্তু আমাদের মন যদি-বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। কেননা, পর্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে চিন্তায় শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে চিন্তা রাষ্ট্রগত, সে দিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন-কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হতে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

২

মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এশিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদপ্রধান বলে খর্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা করে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি-দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।

সচল প্রাণের শক্তি যত দুর্বল হয়ে আসে দেহের জড়ত্ব ততই নানা আকারে উৎকট হয়ে ওঠে। একদিন ধর্মে কর্মে জ্ঞানে এশিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেই প্রাণধর্মের প্রভাবে তার আত্মসৃষ্টি বিচিত্র হয়ে উঠত। তার শক্তি যখন ক্লান্ত ও সুপ্তিমগ্ন হল, তার সৃষ্টির কাজ যখন হল বন্ধ, তখন তার ধর্মকর্ম অভ্যস্ত আচারের যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিরর্থক হয়ে উঠল। একেই বলে জড়তত্ত্ব, এতেই মানুষের সকল দিকে পরাভব ঘটায়।

অপরপক্ষে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ আজ যা দেখা দিয়েছে সেও একই কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব

সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধছে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুলছে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধন-খোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয়, তার কারণ মত্ততা।

বয়স যখন অল্প ছিল তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েছি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা করে তার সাধকের 'পরে ভক্তি হয়েছে মনে। এর ভিতর দিয়ে মানুষের যে পরিচয় আজ চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে তার মধ্যেই তো শাশ্বত মানুষের প্রকাশ; এই প্রকাশকে লোভান্ধ মানুষ অবমানিত করতে পারে। সেই পাপে হীনমতি নিজেকেই সে নষ্ট করবে কিন্তু মহৎকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই মহৎ, সেই জাগ্রত মানুষকে দেখব বলেই একদিন ঘরের থেকে দূরে বেরিয়েছিলুম, য়ুরোপে গিয়েছিলুম ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে।

এই যাত্রাকে শুভ বলেই গণ্য করি। কেননা, আমরা এশিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা, এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেমন সহজ শরীর এবং বর্ম-পরা শরীরের ধর্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায়, আর-একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখলুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে এদের কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো-বা বরণীয়। আমি তাকে ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ফিরেও পেয়েছি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।

কিন্তু সেই কারণেই একটা কথা মনে করে বেদনা বোধ করি। যে দেশে বহুসংখ্যক লোকের মন পলিটিক্সের যন্ত্রটার মধ্যেই পাক খেয়ে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা যন্ত্রের ছাঁদে পাকা হয়ে ওঠে। কাজ উদ্ধার করবার নৈপুণ্য একান্ত লক্ষ্য হয়।

একেই বলে যান্ত্রিক জড়তা, কেননা, যন্ত্রের চরম সার্থক্য কাজের সাফল্যে। পাশ্চাত্য দেশে মানবচরিত্রে এই যান্ত্রিক বিকার ক্রমেই বেড়ে উঠছে এটা লক্ষ্য না করে থাকা যায় না। মানুষ-যন্ত্রের কল্যাণবুদ্ধি অসাড় হয়ে আসছে তার প্রমাণ পূর্বদেশে আমাদের কাছে আর ঢাকা রইল না। মনে পড়ছে ইরাকে একজন সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইংরেজ জাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার।' আমি বললেম, 'তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best।' তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর যারা next best?' চুপ করে রইলুম। উত্তর দিতে হলে অসংযত ভাষায় আশঙ্কা ছিল। এশিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next best-এর সঙ্গেই। তাদের সংখ্যা বেশি, প্রভাব বেশি, তাদের স্মৃতি বহুব্যাপক লোকের মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে। তাদের সহজ মানুষের স্বভাব আমাদের জন্যে নয়, এবং সে স্বভাব তাদের নিজেদের জন্যেও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসছে।

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে। এই সর্বনাশা বুদ্ধি যে আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেছে কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনো মরে নি। এতবড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয় নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দেখা যায় এশিয়ার নাড়ি হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ, য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল। আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই। য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এশিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, কেননা, য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করছে, 'But the next best?'

আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরি-শিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে— এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি, এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এশিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠছে সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এশিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু করে দিয়েছে এশিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় ভাবীকালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গনে দিতে হবে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হল বলেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি বলি নে। আমি এই বলতে চাই, এশিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এশিয়া তাকে নতুন করে আপন ভাষা দিক। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তা হলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক, এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে তার খবর দূর থেকে শোনা যায়। যখন ভাবছিলুম তুরুস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত করে নতুন করে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা সহজ হল ছোটো পরিধির মধ্যে। সাম্রাজ্য বলতে বোঝায়, যারা আত্মীয় নয় তাদের অনেককে দড়ির বাঁধনে বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক স্থূল করে তোলা। দুঃসময়ে বাঁধন যখন ঢিলে হয় তখন ওই অনাত্মীয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হতে থাকে। তুরুস্ক হালকা হয়ে গিয়েই যথার্থ আঁট হয়ে উঠল। তখন ইংলণ্ড তাকে

তাড়া করেছে গ্রীসকে তার উপর লেলিয়ে দিয়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতক্তে তখন বসে আছেন লয়েড জর্জ ও চার্চ্‌হিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে তখনকার মিত্রশক্তিরা একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় আঙ্গোরার প্রতিনিধি বেকির সামী তুরুস্কের হয়ে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনেকটা পরিমাণে ত্যাগ করতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীস আপন ষোলো-আনা দাবির 'পরেই জেদ ধরে বসে রইল, ইংলণ্ড পশ্চাৎ থেকে তার সমর্থন করলে। অর্থাৎ কালনেমি-মামার লঙ্কাভাগের উৎসাহ তখনো খুব ঝাঁঝালো ছিল।

এই গোলমালের সময় তুরুস্ক মৈত্রী বিস্তার করলে ফ্রান্সের সঙ্গে। পারস্য এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হয়ে গেল। আফগানিস্থানের সন্ধিপত্রের দ্বিতীয় দফায় লেখা আছে :

The contracting parties recognize the emancipation of the nations of the East and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent and to govern themselves in whatever manner they themselves choose.

এ দিকে চলল গ্রীস তুরুস্কের লড়াই। এখনো আঙ্গোরা-পক্ষ রক্তপাত-নিবারণের উদ্দেশে বারবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে। কিন্তু ইংলণ্ড ও গ্রীস তার বিরুদ্ধে অবিচলিত রইল। শেষে সকল কথাবার্তা থামল গ্রীসের পরাজয়ে। কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরুস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আঙ্গোরা রাজধানীতে।

নব তুরুস্ক এক দিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর-এক দিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্‌বোধন সকলের আগে চাই। তুরুস্কের বিচারবিভাগের মন্ত্রী বললেন, 'Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern, civilised nation and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us.' এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসংগতভাবে প্রাণযাত্রানির্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধসংস্কার। আধুনিক লোক-ব্যবহারে তার প্রতি নির্মম হতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।

যুদ্ধজয়ের পরে কামালপাশা যখন স্মির্না শহরে প্রবেশ করলেন সেখানে একটি সর্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, 'যুদ্ধে আমরা নিঃসংশয়িত জয়সাধন করেছি, কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না কর। শিক্ষার

জয়সাধন কর তোমরা, তা হলে আমরা যতটুকু করেছি তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারবে। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি আধুনিক প্রাণযাত্রার পথে তোমরা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর না হও। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি তোমরা গ্রহণ না কর আধুনিক জীবননির্বাহনীতি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।'

এ যুগে য়ুরোপ সত্যের একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। সেই সাধনার ফল সকল কালের সকল মানুষের জন্যেই, তাকে যে না গ্রহণ করবে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এই কথা এশিয়ার পূর্বতম প্রান্তে জাপান স্বীকার করেছে এবং পশ্চিমতম প্রান্তে স্বীকার করেছে তুরুস্ক। ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই এই অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্ছে মনকে সংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।

কথাটা সত্য। কিন্তু আরো চিন্তা করবার বিষয় আছে। য়ুরোপ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছে সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে অনেক দিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। যেখানে করে নি, সে জায়গাটা গভীরে, মূলে, তাই সেটা অনেক কাল থেকে প্রচ্ছন্ন রইল। এইখানে সে বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতি করেছে এবং সেই ক্ষতি ক্রমেই ফিরে আসছে তার নিজের অভিমুখে। তার যে লোভ চীনকে আফিম খাইয়েছে সে লোভ তো চীনের মরণের মধ্যেই মরে না। সেই নির্দয় লোভ প্রত্যহ তার নিজেকে মোহান্ধ করছেই, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয়, মানবজগতেও নিষ্কাম চিত্তে সত্য ব্যবহার মানুষের আত্মরক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনার প্রতি পাশ্চাত্য দেশ প্রতিদিন শ্রদ্ধা হারাচ্ছে, তা নিয়ে তার লজ্জাও যাচ্ছে চলে। তাই জটিল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত সমস্যা, বিনাশ হয়ে এল আসন্ন। য়ুরোপীয় স্বভাবের অন্ধ অনুবর্তী জাপান সিদ্ধিমদমত্ততায় নিত্যতত্ত্বের কথাটা ভুলেছে তা দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু চিরন্তন শ্রেয়স্তত্ত্ব আপন অমোঘ শাসন ভুলবে না এ কথা নিশ্চিত জেনে রাখা চাই।

নবযুগের আহ্বানে পশ্চিম এশিয়া কী রকম সাড়া দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে জানা ভালো। খুব বড়ো করে সেটা জানবার এখনো সময় হয় নি। এখানে ওখানে একটু একটু লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো প্রবল করে চোখে পড়বার নয়। কিন্তু সত্য ছোটো হয়েই আসে। সেই সত্য এশিয়ার সেই দুর্বলতাকে আঘাত করতে শুরু করেছে যেখানে অন্ধ সংস্কারে, জড় প্রথায় তার চলাচলের পথ বন্ধ। এ পথ এখনো খোলসা হয় নি, কিন্তু দেখা যায় এই দিকে তার মনটা বিচলিত। এশিয়ার নানা দেশেই

এমন কথা উঠেছে যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানবের সকল ক্ষেত্র জুড়ে থাকলে চলবে না। প্যালেস্টাইন-শাসনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে বিদায়ভোজ দেওয়ার সভায় তিনি যখন বললেন, Palestine is a Mahommedan country, and its government should, therefore, be in the hands of the Mahommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are represented in it,' তখন জেরুজিলামের মুফ্‌তি হাজি এমিন এল্‌-হুসেইনি উত্তর করলেন, 'For us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no distinctions between Mahommedan and Christian Arabs. We regard the Christians not as a minority, but as Arabs.'

জানি এই উদারবুদ্ধি সকলের, এমন-কি, অধিকাংশ লোকের নেই। তবু সে যে ছোটো বীজের মতো অতি ছোটো জায়গা জুড়েই নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে এইটে আশার কথা। বর্তমানে এ ছোটো, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ছোটো নয়।

আর-একটা অখ্যাত কোণে কী ঘটছে চেয়ে দেখো। রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অতি অল্পকালের মধ্যেই এশিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে, এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে, সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের, সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই-সব ছোটো ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাব্লিক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্বেই অন্যত্র বলেছি, বহুজাতিসংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয়সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এশিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাই বহুযুগ পরে এশিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়াল। এই মুক্তিপ্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখযন্ত্রণা থাক্‌, তবু এই উদ্যম, মনুষ্যগৌরব লাভের জন্যে এই-যে আপন সব-কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে।

এ কথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে, য়ুরোপ আজ নিজের ঘরে এবং নিজের বাইরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ।' আমি বলেছিলুম, 'য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।' য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে, প্রাণের আলো জ্বলছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানা দিকে প্রকাশ করছে।

সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি।' তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হল।

রোগশয্যা থেকে তখন সবে উঠেছি। ডাক্তারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম না— সাহস ছিল না— গরমের দিনে জলস্থলের উপর দিয়ে রৌদ্রের তাপ এবং কলের নাড়া খেতে খেতে দীর্ঘ পথ বেয়ে চলব সে সাহসেরও অভাব ছিল। আকাশযানে উঠে পড়লুম। ঘরের কোণে একলা বসে যে বালক দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আহ্বান শুনতে পেত আজ সেই দূরের আহ্বানে সে সাড়া দিল ওই আকাশের পথ বেয়েই। পারস্যের দ্বারে এসে নামলুম দুদিন পরেই। তার পরদিন সকালে পৌঁছলুম বুশেয়ারে।

৩

বুশেয়ার সমুদ্রের ধারে জাহাজ-ঘাটার শহর। পারস্যের অন্তরঙ্গ স্থান এ নয়।

বৈকালে পারসিক পার্লামেন্টের একজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন আমি কী জানতে চাই। বললুম, পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই, যে পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি বললেন, বড়ো মুশকিল। সে পারস্য কোথায় কে জানে। এ দেশে এক বৃহৎ দল আছে তারা অশিক্ষিত, পুরোনো তাদের মধ্যে অপভ্রষ্ট, নতুন তাদের মধ্যে অনুদ্‌গত। শিক্ষিত বিশেষণে যারা খ্যাত তারা আধুনিক ; নতুনকে তারা চিনতে আরম্ভ করেছে, পুরোনোকে তারা চেনে না।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই মধ্যে দেশ প্রকাশমান নয়, বহুর মধ্যে সে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট। দেশের যথার্থ প্রকাশ কোনো কোনো বিশেষ মানুষের জীবনে ও

উপলব্ধিতে। দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা-কোনো ফাটল দিয়ে একটি-কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে। যা গভীরের মধ্যে সঞ্চিত তা সর্বত্র বহুলোকের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয় না। যা অধিকাংশের আবিল চিত্তের আড়ালে থাকে তা কারো কারো প্রকৃতিগত মানসিক স্বচ্ছতার কাছে সহজেই অভিব্যক্ত হয়। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা কতদূর, তাঁকে দেশ মানে কি মানে না, সে কথা অবান্তর। সেরকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে; তারা সম্ভবত নামজাদাদের দলের মধ্যে নয়, এমন-কি, তারা বিদেশীদের কেউ হতেও পারে। কিন্তু পথিক মানুষ কোথায় তাদের খুঁজে পাবে।

যাঁর বাড়িতে আছি তাঁর নাম মাহ্‌মুদ রেজা। তিনি জমিদার ও ব্যবসায়ী। নিজের ঘরদুয়োর ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন কম নয়, নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে নিজের অভ্যস্ত আরামের উপকরণকে উলটোপালটা করেছেন। আড়ালে থেকে সমস্তক্ষণ আমাদের প্রয়োজনসাধনে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সর্বদা সমুখে এসে সামাজিকতার অভিঘাতে আমাদের ব্যস্ত করেন না। এঁর বয়স অল্প, শান্ত প্রকৃতি, সর্বদা কর্মপরায়ণ।

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলেছে। এই জিনিসটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাই নে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেই-বা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়; এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার 'পরে আরোপ করতে এদের বাধে নি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েছি। অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকদের আদর, পলিটিশিয়নদের দরবারে তার আসন পড়ে না, এখানে সেই গণ্ডী দেখা গেল না। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেছেন তাঁরা প্রধানত রাজদরবারীদের দল। মনে পড়ল ঈজিপ্টের কথা। সেখানে যখন গেলেম রাষ্ট্রনেতারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে এলেন। বললেন, এই উপলক্ষে তাঁদের পার্লামেন্টের সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি রাখতে হল। প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব। এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেইজন্যে এরা অগ্রসর

হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে, কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য-অভিমানবোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তার পরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি, এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজ-পথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনাপাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করে নি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্টই অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডীর, সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষই আমার গোচর হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দুসভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরো কঠিন। বাংলায় নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই, দক্ষিণেই যাই, কারো ঘরের মধ্যে আপন স্থান করে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চলতে হয়— এমন-কি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় বলে বিখ্যাত, সে আতিথ্যে পঙ্‌ক্তিভেদ নেই।

১৬ এপ্রেল। সকাল সাতটায় সময় শিরাজ অভিমুখে ছাড়বার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত তবু অভ্যাসমত ভোরে উঠেছি, তখন আর-সকলে শয্যাগত। সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে বেরতে নটা পেরিয়ে গেল।

মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ির চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বোঝা।

মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির

চিহ্ন দেখি নে। পারস্যদেশের বেশির ভাগ উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ে বেষ্টিত, আবার মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী। এই মালভূমি সমুদ্র-উপরিতল থেকে পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উঁচু। এর মাঝখানটা নেমে গিয়েছে প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। এই অধিত্যকায় পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘ পৌঁছতে বাধা পায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। পর্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্বরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষীণজল এই স্রোতগুলি সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় পৌঁছয় না, মরু নেয় তাদের শুষে কিম্বা জলার মধ্যে তাদের দুর্গতি ঘটে।

বন্ধুর পথে নাড়া খেতে খেতে ক্রমে সেই বিশাল নীরস শূন্যতার মধ্যে দূরে দেখা যায় খেজুরের কুঞ্জ, কোথাও-বা বাবলা। এই জনবিরল জায়গায় দশ মাইল অন্তর সশস্ত্র পুলিস পাহারা। পথে পথিক প্রায় দেখি নে। আমাদের দেশ হলে আর্তনাদ-মুখর গোরুর গাড়ি দেখা যেত। এ দেশে তার জায়গায় পিঠের দুই পাশে বোঝা ঝুলিয়ে গাধা কিম্বা দল-বাঁধা খচ্চর, মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল নিয়ে মেষপালক, দুই-এক জায়গায় কাঁটাঝোপের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে উটের দল।

বেলা যায়, রৌদ্র বেড়ে ওঠে। মোটর-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলো উড়িয়ে বাতাস বইছে, আমাদের শীতের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। কচিৎ এক-এক জায়গায় দেখি তোরণওয়ালা মাটির ছোটো কেল্লা, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডান দিগন্তে একটা পাহাড়ের চেহারা ফুটে উঠেছে, যাত্রা-আরম্ভে আকাশের ঘোলা নীলের মধ্যে এ পাহাড় অবগুণ্ঠিত ছিল।

এই অঞ্চলটায় বাষ্‌ক্রি জাতের বাস, তাদের ভাষা তুর্কি। পূর্বতন রাজার আমলে এখানে তাদের বসতি পত্তন হয়। এদের ব্যাবসা ছিল দস্যুবৃত্তি। নূতন আমলে এদের ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। শোনা গেল কিছুদিন আগে পথের মধ্যে এরা একটা সাঁকো ভেঙে রেখেছিল। মালবোঝাই মোটরবাস উলটে পড়তেই খুনজখম লুটপাট করে। এই ঘটনার পরে রাজা তাদের প্রধানের ছেলেকে জামিনস্বরূপে তেহেরানে নিয়ে রেখেছেন। শাস্তিটা কঠোর নয়, অথচ কেজো। এই জাতের দলপতি শাকুরুল্লা খাঁ তাঁর বসতিগ্রাম থেকে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর কয়েক বছর আগে হলে এই অভিবাদনের ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত, যাকে বলা যেতে পারত মর্মগ্রাহী। বুশেয়ার থেকে বরাবর আমাদের গাড়ির আগে আগে আর-একটি মোটরে বন্দুকধারী পাহারা চলেছে। প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝি-বা এটা রাজকায়দার বাহুল্য অলংকার, এখন বোধ হচ্ছে এর একটি জরুরি অর্থ থাকতেও পারে।

মেটে রাস্তা ক্রমে নুড়ি-বিছানো হয়ে এল। বোঝা যায় পাহাড়ের বুকে উঠছি।

পথের প্রান্তে কোথাও-বা গিরিনদী চলেছে পাথরের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। কিন্তু তারা তো লোকালয়ের ধাত্রীর কাজ করছে না। মানুষ কোথায়। মাঠে মাঝে মাঝে আকন্দগাছ কুলগাছ উইলো— মাঝে মাঝে গমের খেতে চাষের পরিচয় পাই, কিন্তু চাষীর পরিচয় পাই নে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়। শিরাজের পথ দীর্ঘ। এক দিনে যেতে কষ্ট হবে বলে স্থির হয়েছে খজেরুনে গবর্নরের আতিথ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু বিলম্বে বেরিয়েছি, সময়মত সেখানে পৌঁছবার আশা নেই, তাই পথে কোনার্‌তাখ্‌তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় আমাদের মোটর গাড়ি থামল। মাটির মেঝের 'পরে তাড়াতাড়ি কম্বল কার্পেট বিছিয়ে দিলে। সঙ্গে আহার্য ছিল, খেয়ে নিলুম। মনে হল, এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুর-কুঞ্জের মাঝখানে।

এবার পাহাড়ে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে উঠছি। পাহাড়গুলো সম্পূর্ণ টাক-পড়া, এমন-কি, পাথরেরও প্রাধান্য কম। বড়ো বড়ো মাটির স্তূপ। যেন মুড়িয়ে দেওয়া দৈত্যের মাথা। বোঝা যায় এটা বৃষ্টিবিরল দেশ, নইলে গাছের শিকড় যে মাটিকে বেঁধে রাখে নি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিঁকতে পারে। স্বল্পপথিক পথে মাঝে মাঝে কেরোসিনের বোঝা নিয়ে গাধা চলেছে। বোঝাই-করা বড়ো বড়ো সরকারি মোটর বাস আমাদের পথ বাঁচিয়ে নড়বড় করে ছুটেছে নীচের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তৃণহীন জনহীন রুক্ষ, যেন পৃথিবীর বুক থেকে একটা তৃষার্ত দৈত্যের অশ্রুহীন কান্না ফুলে ফুলে উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

বেলা যায়। এক জায়গায় দেখি পথের মধ্যে খজেরুনের গবর্নর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন আমাদের আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বোঝা গেল তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন।

প্রাসাদে পৌঁছলুম। বড়ো বড়ো কমলালেবুগাছের ঘনসংহত বীথিকা ; স্নিগ্ধচ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে। সেকালের মনোরম বাগান, নাম বাগ-ই-নজর। নিঃস্ব রিক্ততার মাঝখানে হঠাৎ এইরকম সবুজ ঐশ্বর্যের দানসত্র, এইটেই পারস্যের বিশেষত্ব।

বাগানের তরুতলে আমাদের ভোজের আয়োজন। কিন্তু এখনকার মতো ব্যর্থ হল। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত। একটি কার্পেট-বিছানো ছোটো ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বাতাসে তাপ নেই, সামনে খোলা দরজা দিয়ে ঘন সবুজের উচ্ছ্বাস চোখে এসে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে বাগানে গিয়ে দেখি, গাছতলায় বড়ো বড়ো ডেকচিতে

মোটা মোটা পাচক রান্না চড়িয়েছে, আমাদের দেশে যজ্ঞের রান্নার মতো। বুঝলুম রাত্রিভোজের উদ্যোগপর্ব।

অতিথির সম্মানে আজ এখানে সরকারি ছুটি। সেই সুযোগে অনেকক্ষণ থেকে লোক জমায়েত হয়েছিল। আমাদের দেরি হওয়াতে ফিরে গেছে। যাঁরা বাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে গেলুম। সকলেরই মুখে তাঁদের রাজার কথা। বললেন, তিনি অসামান্য প্রতিভার জোরে দশ বছরের মধ্যে পারস্যের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছেন।

এইখানে আধুনিক পারস্য-ইতিহাসের একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কাজার-জাতীয় আগা মহম্মদ খাঁর দানবিক নিষ্ঠুরতায় এই ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায় আরম্ভ হল। এরা পারসিক নয়। কাজাররা তুর্কিজাতের লোক। তৈমুরলঙ এদের পারস্যে নিয়ে আসে। বর্তমানে রেজা শা পহ্লবীর আমলের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের রাজসিংহাসন এইজাতীয় রাজাদের হাতেই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শা নাসিরউদ্দিন ছিলেন রাজা। তখন থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। এই সময়ে পারস্যের মন যে জেগে উঠেছে তার একটা নিদর্শন দেখা যায় বাবিপন্থীদের ধর্মবিপ্লবে। ঠিক এই সময়েই রামমোহন রায় বাংলাদেশে প্রচার করেছিলেন ধর্মসংস্কার। নাসিরউদ্দিন অতি নিষ্ঠুরভাবে এই সম্প্রদায়কে দলন করেন।

পারস্যের রাজাদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন প্রথম য়ুরোপে যান আর তাঁর আমল থেকেই দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করা শুরু হল। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফর-উদ্দিনের আমলে এই জাল বিস্তৃত হবার দিকে চলল। তামাকের ব্যাবসার একচেটে অধিকার তিনি দিলেন এক ইংরেজ কোম্পানিকে। এটা দেশের লোকের সইল না, তারা তামাক বয়কট করে দিলে। দেশসুদ্ধ তামাকখোরদের তামাক ছাড়া সোজা নয়, কিন্তু তাও ঘটল। এই উপায়ে এটা রদ হয়ে গেল, কিন্তু দণ্ড দিতে হল কোম্পানিকে খুব লম্বা মাপে। তার পরে লাগল রাশিয়া, তার হাতে রেলওয়ে। বেলজিয়ম থেকে কর্মচারী এল পারস্যে ট্যাক্স আদায়ের কাজে, ইংরেজও উঠে পড়ে লাগল পারস্য-বিভাগের কাজে।

এ দিকে দেশের লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে রাষ্ট্রসংস্কারের। শেষকালে রাজাকে মেনে নিতে হল। প্রথম পারসিক পার্লামেন্ট খুলল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে।

এ রাজা মারা গেলেন। ছেলে বসলেন গদিতে, শা মহম্মদ আলি। পারস্যে তখন প্রাদেশিক গবর্নররা ছিল এক-এক নবাববিশেষ, তারা সকল বিষয়েই দেয় বাধা। প্রজারা এদের বরখাস্ত করবার দাবি করলে, আর মাশুল-আদায়ের বেলজিয়ান কর্তাদেরও সরিয়ে দেবার প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উঠল।

বলা বাহুল্য, দেশের লোক পার্লামেণ্ট শাসনপদ্ধতিতে ছিল আনাড়ি। দায়িত্ব হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে তাদের হাত পেকে উঠল। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, রাজস্ববিভাগ ছারখার।

অবশেষে একদা ইংরেজে রাশিয়ানে আপস হয়ে গেল। দুই কর্তার একজন পারস্যের মুণ্ডের দিকে আর-একজন তার লেজের দিকে দুই হাওদা চড়িয়ে সওয়ার হয়ে বসল, অঙ্কুশরূপে সঙ্গে রইল সৈন্যসামন্ত। উত্তর দিকটা পড়ল রুশীয়ের ভাগে, দক্ষিণ দিকটা ইংরেজের, অল্প একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

রাজায় প্রজায় তকরার বেড়ে চলল। একদিন রাজার দল মোল্লার দলে মিশে পড়ল গিয়ে শহরের উপর, পার্লামেণ্টের বাড়ি দিলে ভূমিসাৎ করে। কিন্তু দেশকে দাবিয়ে দিতে পারল না, আবার একবার নতুন করে কনস্টিট্যুশনের পত্তন হল।

ইংরেজ ও রুশ উভয়েই মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে শাহকে দেশের লোক এমন বিশ্রীরকম ব্যস্ত করছে বলে। বলাই বাহুল্য, নতুন কনস্টিট্যুশনের প্রতি তাদের দরদ ছিল না। রুশীয় কর্নেল লিয়াকভ একদিন সৈন্য নিয়ে পড়ল পার্লামেণ্টের উপরে। লড়াই বেধে গেল, বড়ো বড়ো অনেক সদস্য গেলেন মারা, কেউ-বা হলেন বন্দী, কেউ-বা গেলেন পালিয়ে। লণ্ডন টাইম্‌স্‌ বললেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে স্বরাজতন্ত্র ওরিয়েণ্টালদের ক্ষমতার অতীত।

তেহেরানকে ভীষণ অত্যাচারে নির্জীব করলে বটে, কিন্তু অন্য প্রদেশে যুদ্ধ চলতে লাগল। শেষে পালাতে হল রাজাকে দেশ ছেড়ে, তাঁর এগারো বছরের ছেলে উঠলেন রাজগদিতে। রাজা যাতে মোটা পেনসন পান ইংরেজ এবং রুশ তার ব্যবস্থা করলেন। রুশীয়ের সাহায্যে পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ করলেন। হার হল তাঁর।

আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ববিভাগকে খাড়া করে তুলতে। ঠিক যে সময়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন, রাশিয়া বিরুদ্ধে লাগল। পারস্যের উপর হুকুম জারি হল শুস্টারকে বিদায় করতে হবে। প্রস্তাব হল, ইংরেজ

এবং রুশের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে রাষ্ট্রকার্যে আহ্বান করা চলবে না। এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিরুদ্ধ আন্দোলন চলল। কিন্তু টিঁকল না। শুস্টার নিলেন বিদায়, রাষ্ট্রসংস্কারকরা কেউ-বা গেলেন জেলে, কেউ-বা গেলেন বিদেশে। এইসময়কার বিবরণ নিয়ে শুস্টার The Strangling of Persia -নামক যে বই লিখেছেন তার মতো শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।

এ দিকে য়ুরোপের যুদ্ধ বাধল। তখন রুশিয়া সেই সুযোগে পারস্যে আপন আসন আরো ফলাও করে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। অবশেষে বলশেভিক বিপ্লবের তাড়ায় তারা গেল সরে। এই সুযোগে ইংরেজ বসল উত্তর-পারস্য দখল করে। নিরন্তর লড়াই চলল দেশবাসীদের সঙ্গে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সার পার্সি কক্স্ এলেন পারস্যে ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনি পারসিক গবর্মেণ্টের এক দলের কাছ থেকে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, সমগ্র পারস্যের আধিপত্য থাকবে ইংরেজের হাতে, তার শাসনকার্য ও সৈন্যবিভাগ ইংরেজের অঙ্গুলিসংকেতে চালিত হবে। এ'কে ভদ্রভাষায় বলে প্রোটেক্‌টোরেট্‌। এর নিগূঢ় অর্থটা সকলেরই কাছে সুবিদিত— অর্থাৎ, ওর উপক্রমণিকা বৈষ্ণবের ঝুলিতে, ওর উপসংহার শাক্তের কবলে। যাই হোক, সম্পূর্ণ পার্লামেণ্টের কাছে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে পেশ করতে কারো সাহস হল না।

এই দুর্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরান। ও দিকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর-পারস্যে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে এল। ইংরেজ পারস্য ত্যাগ করলে। এতকালের নিরন্তর নিপীড়নের পর পারস্য সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্‌স্টাইন এসে এই লেখাপড়া করে দিলেন যে, এত কাল সাম্রাজ্যিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্তন করেছিল সোভিয়েট গবর্মেণ্ট তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হল এবং রাশিয়া পারস্যে যে-সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবি না করে সে সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হল।

রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তার পরে প্রধান মন্ত্রী, তার পরে প্রজা-সাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে যে-সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ-লুণ্ঠন-বিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ্ কণ্ঠা

পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জনী তুলে। উদ্‌ভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জয় হোক রেজা শা পহ্লবীর।

এঁদের কাছে আর-একটা খবর পাওয়া গেল, দেশের টাকা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। বিদেশ থেকে যারা কারবার করতে আসে সমান মূল্যের জিনিস এখান থেকে না কিনলে তাদের মাল বিক্রি বন্ধ। আমদানি রফতানির মধ্যে অসাম্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি।

৪

আমার শরীর ক্লান্ত তাই রাত্রের আহার [illegible]লা আমার ঘরে পাঠাবেন বলে এঁরা ঠিক করেছিলেন। রাজি হলুম না। বাগানে গাছতলায় দীপের আলোকে সকলের সঙ্গে খেতে বসলুম। এখানকার দেশী ভোজ্য। পোলাও কাবাব প্রভৃতিতে আমাদের দেশের মোগলাই খানার সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না।

ক্লান্ত শরীরে শুতে গেলুম। যথারীতি ভোরের বেলায় প্রস্তুত হয়ে যখন দরজা খুলে দিয়েছি তখন দুটি-একটি পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

যাত্রা যখন আরম্ভ হল তখন বেলা সাড়ে-সাতটা। বাইরে আফিমের খেতে ফুল ধরেছে। গেটের সামনে পথের ও পারে দোকান খুলেছে সবেমাত্র। সুন্দর স্নিগ্ধ সকালবেলা। বাঁ ধারে নিবিড় সবুজবর্ণ দাঁড়িমের বন— গমের খেত, তাতে নতুন চারা উঠেছে। এ বৎসর দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে ফসলে তেজ নেই, তবু এ জায়গাটি তৃণে গুল্মে রোমাঞ্চিত।

উপলবিকীর্ণ পথে ঠোকর খেতে খেতে গাড়ি চলেছে। উঁচু পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এসে নামল। অন্যত্র সাধারণত নগরের কিছু আগে থাকতেই তার উপক্রমণিকা দেখা যায়, এখানে তেমন নয়, শূন্য মাঠের প্রান্তে অকস্মাৎ শিরাজ বিরাজমান। মাটির তৈরি পাঁচিলগুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল পপলার কমলালেবু চেস্ট্‌নাট এল্‌ম্‌ গাছের মাথা।

শিরাজের গবর্নর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেট-পাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সামনে ফলমিষ্টান্নসহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোটো ছোটো টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজ-নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই— শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার

চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে উর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বললেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।

সভার পালা শেষ হলে পর চললেম গবর্নরের প্রাসাদে। পথে যে শিরাজের পরিচয় হল সে নূতন শিরাজ। রাস্তা ঘরবাড়ি -তৈরি চলছে। পারস্যের শহরে শহরে এই নূতন রচনার কাজ সর্বত্রই জেগে উঠল, নূতন যুগের অভ্যর্থনায় সমস্ত দেশ উৎসাহিত।

সৈনিকপঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হয়ে গবর্নরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেম। মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অন্য সকল অনুষ্ঠানের পূর্বেই যাতে বিশ্রাম করতে পারি সেই প্রার্থনামতই ব্যবস্থা হল। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলুম শোবার ঘরে। তখন বেলা চারটে। রাত্রে নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে আহার করে দীর্ঘদিনের অবসান।

সকালে গবর্নর বললেন, কাছে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ি আছে, সেটা আমাদের বাসের জন্য প্রস্তুত। সেখানেই আমার বিশ্রামের সুবিধা হবে বলে বাসা-বদল স্থির হল।

১৭ এপ্রেল। আজ অপরাহ্ণে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্নর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধিস্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, কচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার
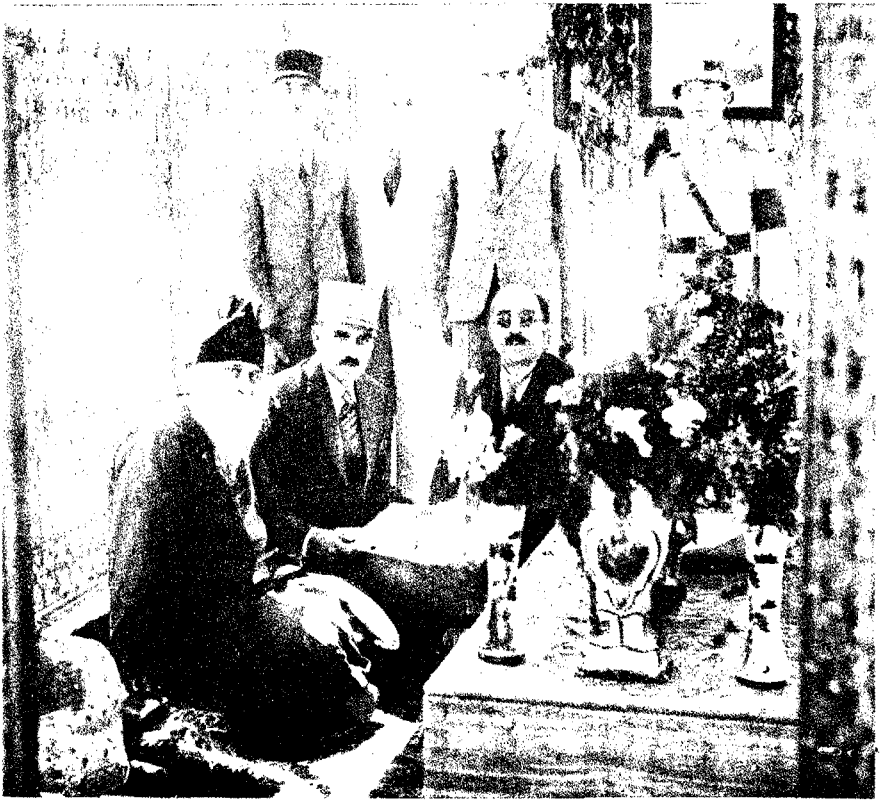
আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।

আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণীনির্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁকে। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে, এমন-কি, এক দেশেই, বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোশাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হালকা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের— যারা সবাই একই বড়োরাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরুস্ক ঈজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্বজনীন উর্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতি-পরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়তো-বা পোশাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড-ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে। ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল। মেয়েদের বেশে পরিবর্তনের ধাক্কা এমন করে লাগে নি— কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার মধ্যে গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতি সুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েছে, মেজের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। সভার ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ও পারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে— অধিকাংশই কালো কাপড়ে আচ্ছন্ন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।

তিনটি পারসিক ভদ্রলোক তেহেরান থেকে এসেছেন আমাদের পথের সুবিধা করে দেবার জন্যে। এঁদের মধ্যে একজন আছেন তিনি পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি। সকলে বলেন ইনি ফিলজফার; সৌম্য শান্ত এঁর মূর্তি। ইনি ফ্রেঞ্চ জানেন, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তবু কেবলমাত্র সংসর্গ থেকে এঁর নীরব পরিচয়

আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়। ভাষার বাধায় যে-সব কথা ইনি বলতে পারলেন না, অনুমানে বুঝতে পারি সেগুলি মূল্যবান। ইনি আশা প্রকাশ করলেন আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে। আমি বললুম, আপনাদের পূর্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করি নে। এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা হলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।

আজ সকালে হাফেজের সমাধি হয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা। তার পূর্বে গবর্নরের সঙ্গে এখানকার রাজার সম্বন্ধে আলাপ হল। একদা রেজা শা ছিলেন কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র। বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পান নি, এমন-কি, পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়ল আমাদের আকবর বাদশাহের কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের-আধিপত্যজালে-দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আমি বললুম, দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্নর বললেন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে যতদিন না ভারত একাত্ম হবে ততদিন গোলটেবিল বৈঠকের বরগ্রহণ করে তার নিষ্কৃতি নেই। অন্ধ যারা তারা ছাড়া পেলেও এগোয় না, এগোতে গেলেও মরে গর্তে পড়ে।

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিস-রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো

একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্নরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে এলুম। যাঁর বাড়ি তাঁর নাম শিরাজী। কলকাতায় ব্যাবসা করেন। তাঁরই ভাইপো খলিলী আতিথ্যভার নিয়েছেন। পরিষ্কার নতুন বাড়ি, সামনেটি খোলা, অদূরে একটি ছোটো পাহাড়। কাঁচের শাসির মধ্যে দিয়ে প্রচুর আলো এসে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে। প্রত্যেক ঘরেই ছোটো ছোটো টেবিলে বাদাম কিশ্‌মিশ্‌ মিষ্টান্ন সাজানো।

চা খাওয়া হলে পর এখানকার গান-বাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতারজাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তাল দেবার যন্ত্র— বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য

অংশ ধীরমন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখতে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখছি— এখানকার সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

ইস্ফাহানে যাত্রা করবার পূর্বে বিশ্রাম করে নিচ্ছি। বসে আছি দোতলার মাদুর-পাতা লম্বা বারান্দায়। সম্মুখপ্রান্তে রেলিঙের গায়ে গায়ে টবে সাজানো পুষ্পিত জেরেনিয়ম। নীচের বাগানে ফুলের কেয়ারির মাঝখানে ছোটো জলাশয়ে একটি নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা, আর সেই কেয়ারিকে প্রদক্ষিণ করে কলশব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে। অদূরে বনস্পতির বীথিকা। আকাশে পাণ্ডুর নীলিমার গায়ে তরুহীন বলি-অঙ্কিত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর রেখা। দূরে গাছের তলায় কারা একদল বসে গল্প করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। শহর থেকে দূরে আছি, জনতার সম্পর্ক নেই, পাখিরা কিচিমিচি করে উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের নাম জানি নে। সঙ্গীরা শহরে কে কোথায় চলে গেছে, চিরক্লান্ত দেহ চলতে নারাজ তাই একলা বসে আছি। পারস্যে আছি সে কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার কিছুই নেই। এই আকাশ, বাতাস, কম্পমান সবুজ পাতার উপর কম্পমান এই উজ্জ্বল আলো, আমারই দেশের শীতকালের মতো।

শিরাজ শহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবেরা পারস্য জয় করার পরে তবে এই শহরের উদ্ভব। সাফাবি-শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল শহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে তার জায়গায় উঠেছে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর-কোনো দেশ এমন পায় নি, তবু তার জীবনীশক্তি বারবার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্ছিত দশা থেকে।

৫

চলেছি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর শিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা শুরু হল। পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে শিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েছে।

শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেছে এঁকে-বেঁকে সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যখেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখি নে, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া-লোম-ওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও-বা ছাগলের কালো রোঁয়ায় তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল, যেন তারা পাহাড়ের শাবক।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অনতিদূরে পর্সিপোলিস। দিগ্‌বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো পাথরের থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্মম কালকে ধিক্কার দিচ্ছে।

আমাকে চৌকিতে বসিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পাহাড়, ঊর্ধ্বে শূন্য, নীচে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য প্রান্তর, তারই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের রুদ্ধবাণীর সংকেত। বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ জর্মান ডাক্তার হর্টজ্‌ফেল্ট্‌ এই পুরাতন কীর্তি উদ্‌ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত। তিনি বললেন, বর্লিনে আমার বক্তৃতা শুনেছেন আর হোটেলেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পাথরের থামগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। নিরর্থক দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে, ম্যুজিয়মে অতিকায় জন্তুর অসংলগ্ন অস্থিগুলোর মতো। ছাদের জন্য যে-সব কাঠ লেগেছিল, হিসাবের তালিকায় দেখা গেছে, ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেগুন কাঠও ছিল তার মধ্যে। খিলেন বানাবার বিদ্যা তখন জানা ছিল না বলে পাথরের ছাদ সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে বিদ্যার জোরে এই-সকল গুরুভার অতি প্রকাণ্ড পাথরগুলি যথাস্থানে বসানো হয়েছিল সে বিদ্যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ-নির্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো-বা এই দিক থেকেই রাজমিস্ত্রি গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্যে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।

ডাক্তার বললেন, আলেকজাণ্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্তি-অসহিষ্ণু ঈর্ষাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার আকেমেনীয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।

এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্মপত্রে রুপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এর কাছে বর্বরতা। আলেকজান্দার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। এখানে দেয়ালে ক্ষোদিত মূর্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দরিয়ুস আছেন রাজছত্রতলে,

আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্য বহন করে আনছে। পরবর্তীকালে ইস্ফাহানের কোনো উজির এই শিলালেখ্য ভেঙে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে।

পারস্যে আর-এক জায়গা খনন করে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিস পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারই একটি নকশা-কাটা ডিমের খোলার পাত্র আমাকে দেখালেন। বললেন, মহেঞ্জদরোর যেরকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার্ অরেল্‌স্টাইন মধ্য-এশিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিস পেয়েছেন মহেঞ্জদরোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এইরকম বহুদূরবিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার করে অন্তর্ধান করেছে।

অধ্যাপক এই ভগ্নশেষের এক অংশ সংস্কার করে নিজের বাসা করে নিয়েছেন। ঘরের চারি দিকে লাইব্রেরি এবং নানাবিধ সংগ্রহ। দরিয়ুস জারাক্সিস এবং আর্টাজারাক্সিস এই তিন-পুরুষ-বাহী সম্রাটের লুপ্তশেষ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে অধ্যাপক নিভৃতে খুব আনন্দে আছেন।

এ দেশে আসবামাত্র সব চেয়ে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ করে মেসোপোটেমিয়া হয়ে আরব পর্যন্ত নির্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদ-বর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেছে এবং অবরুদ্ধ করেছে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ বলেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে এরা বাহন পেয়েছে উট এবং ঘোড়া, আর জীবিকার জন্যে পালন করেছে ভেড়ার পাল। এই জীবিকার অনুসরণ করে এখানকার মানুষকে নিরন্তর সচল হয়ে থাকতে হল। এই পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বারে বারে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে— তার মূল প্রেরণা পেয়েছে এখানকার ভূমির কঠোরতা থেকে, যা তাদের বাইরে ঠেলে বের করে দেয়। তারা প্রকৃতির অযাচিত আতিথ্য পায় নি, তাদের কেড়ে খেতে হয়েছে পরের অন্ন, আহার সংগ্রহ করতে হয়েছে নূতন নূতন ক্ষেত্রে এগিয়ে এগিয়ে।

এখানে পল্লীর চেয়ে প্রাধান্য দুর্গরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরের। কত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসশেষ পাশ্চাত্য এশিয়ায় ধূলিপরিকীর্ণ। কৃষিজীবীদের স্থান পল্লী, সেখানে ধন স্বহস্তে উৎপাদন করতে হয়। নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়জীবী

যোদ্ধাদের প্রতাপের উপরে। সেখানে সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণ না করলে পরাভব। ভারতবর্ষে কৃষিজীবিকার সহায় গোরু, মধ্য ও পশ্চিম -এশিয়ায় জয়জীবিকার সহায় ঘোড়া। পৃথিবীতে কী মানুষের, কী বাহনের, কী অস্ত্রের ত্বরিত গতিই জয়সাধনের প্রধান উপায়। তাই একদিন মধ্য-এশিয়ার মরুবাহী অশ্বপালক মোগল বর্বরেরা বহুদূর পৃথিবীতে ভীষণ জয়ের সর্বনেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিরচলিষ্ণুতাই তাদের করে তুলেছিল দুর্ধর্ষ। অন্নসংকোচের জন্যেই এরা এক-একটি জ্ঞাতিজাতিতে বিভক্ত, এই জ্ঞাতিজাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য। যে কারণেই হোক, তাদের এই ঐক্য যখন বহু শাখাধারার সম্মিলিত ঐক্যে স্ফীত হয়েছে তখন তাদের জয়বেগকে কিছুতে ঠেকাতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরবীয় মরুবাসী জ্ঞাতিজাতিরা যখন এক অখণ্ড ধর্মের ঐক্যে এক দেবতার নামে মিলেছিল তখন অচিরকালের মধ্যেই তাদের জয়পতাকা উড়েছিল কালবৈশাখীর রক্তরাগরঞ্জিত মেঘের মতো দূর পশ্চিমদিগন্ত থেকে দূর পূর্বদিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত।

একদা আর্যজাতির এক শাখা পর্বতবিকীর্ণ মরুবেষ্টিত পারস্যের উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিলে। তখন কোনো-এক অজ্ঞাতনামা সভ্যজাতি ছিল এখানে। তাদের রচিত যে-সকল কারুদ্রব্যের চিহ্নশেষ পাওয়া যায় তার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক। বোধ করি বলা যেতে পারে মহেঞ্জদারো-যুগের মানুষ। তাদের সঙ্গে এদের হাতের কাজের মিল আছে। এই মিল এশিয়ায় বহুদূরবিস্তৃত। মহেঞ্জদারোর স্মৃতিচিহ্নের সাহায্যে তৎকালীন ধর্মের যে চেহারা দেখতে পাই অনুমান করা যায়, সে বৃষভবাহন শিবের ধর্ম। রাবণ ছিলেন শিবপূজক, রাম ভেঙেছিলেন শিবের ধনু। রাবণ যে জাতের মানুষ সে জাতি না ছিল অরণ্যচর, না ছিল পশুপালক। রামায়ণগত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায়, সে জাতি পরাভূত দেশ থেকে ঐশ্বর্যসংগ্রহ করে নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অনেকদিন বাহুবলে উপেক্ষা করতে পেরেছে আর্যদেবতা ইন্দ্রকে। সে জাতি নগরবাসী। মহেঞ্জদারোর সভ্যতাও নাগরিক। ভারতের আদিম আরণ্যক বর্বরতর জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্যেরা এই সভ্যতা নষ্ট করে। সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক, আজও হিন্দুরা সে উপাখ্যান পাঠ করে ভক্তির সঙ্গে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের কাছে বৈদিক দেবতার খর্বতার কথা গৌরবের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতে আখ্যাত হয়ে থাকে।

খ্রীস্টজন্মের দেড়হাজার বছর পূর্বে ইরানী আর্যরা পারস্যে এসেছিলেন, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত। তাঁদের হোমাগ্নির জয় হল। ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্বর,

জনসংকুল। সেখানকার আদিম জাতের নানা ধর্ম, নানা রীতি। তার সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈদিক ধর্ম আচ্ছন্ন পরিবর্তিত ও অনেক অংশে পরিবর্জিত হল— বহুবিধ, এমন-কি, পরস্পরবিরুদ্ধ হল তার আচার— নানা দেবদেবী নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভ্যাগত হওয়াতে ভারতবর্ষে ধর্মজটিলতার অন্ত রইল না। পারস্যে এবং মোটের উপর পাশ্চাত্য এশিয়ার সর্বত্রই বাসযোগ্য স্থান সংকীর্ণ এবং সেখানে অন্নক্ষেত্রের পরিধি পরিমিত। সেই ছোটো জায়গায় যে আর্যেরা বাসপত্তন করলেন তাঁদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইল, অনার্যজনতার প্রভাবে তাঁদের ধর্মকর্ম বহু জটিল ও বিকৃত হল না। এশিয়ার এই বিভাগে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির বসতি ছিল তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে আছে, কিন্তু ইরানীয়দের আর্যত্বকে তারা অভিভূত করতে পারে নি।

পারস্যের ইতিহাস যখন শাহনামার পুরাণকথা থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন পারস্যে আর্যদের আগমন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তখন দেখি আর্যজাতির দুই শাখা পারস্য-ইতিহাসের আরম্ভকালকে অধিকার করে আছে, মীদিয় এবং পারসিক। মীদিয়েরা প্রথমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে, তার পরে পারসিক। এই পারসিকদের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম-অনুসারে এই জাতি গ্রীক-ভাষায় আকেমেনিড (Achaemenid) আখ্যা পায়। খ্রীস্টজন্মের সাড়ে-পাঁচশো বছর পূর্বে আকেমেনীয় পারসিকেরা মীদিয়দের শাসন থেকে সমস্ত পারস্যকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে একচ্ছত্র করে। সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্‌দা। ভারতীয় আর্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধু কর্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।

তখনকার কালের সেমেটিক জাতীয়দের যুদ্ধে দয়াধর্ম ছিল না। দেশজোড়া হত্যা লুঠ বিধ্বংসন বন্ধন নির্বাসন, এই ছিল রীতি। কিন্তু সাইরস ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের রাষ্ট্রনীতি ছিল তার বিপরীত। তাঁরা বিজিত দেশে ন্যায়বিচার সুব্যবস্থা ও শান্তি স্থাপন করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন, পারসিক রাজারা যুদ্ধ করেছেন মিতাচারিতার সঙ্গে, বিজিত জাতিদের প্রতি অনির্দয়

হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্মে তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের স্বাদেশিক দলনায়কদের স্বপদে রক্ষা করেছেন। তার প্রধান কারণ, কী যুদ্ধে, কী দেশজয়ে, তাঁদের ধর্মনীতিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। ব্যাবিলোনিয়ায় আসীরিয়ায় পূজার ব্যবহারে ছিল দেবমূর্তি। বিজেতারা বিজিত জাতির এই-সব মূর্তি নিয়ে যেত লুঠ করে। সাইরসের ব্যবহার ছিল তার বিপরীত। এইরকম লুঠ-করা মূর্তি তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সেগুলি সব তাদের আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তার অনতিকাল পরে তাঁরই জ্ঞাতিবংশীয় দরিয়ুস সাম্রাজ্যকে শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার করে আরো বহুদূর প্রসারিত করেন। পর্সিপোলিসের স্থাপনা এঁরই সময় হতে। এই যুগের আসীরিয়া ব্যাবিলন ঈজিপ্ট্ গ্রীস প্রভৃতি দেশে বহু কীর্তি প্রধানত দেবমন্দির আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আকেমেনীয় রাজত্বে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। শত্রুজয়ের বিবরণচিত্র যে-যেখানে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত সেখানেই জরথুস্ত্রীয়দের বরণীয় দেবতা অহুরমজ্দার ছবি শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধিলাভ যে তাঁরই প্রসাদে এই কথাটি তার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু মন্দিরে মূর্তিস্থাপন করে পূজা হত তার প্রমাণ নেই। প্রতীকরূপে অগ্নিস্থাপনার চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম আরম্ভ হতেই একদেবতার সরল পূজাপদ্ধতি পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দেবার সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলই তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয়, বিশেষত চারি দিকে যেখানে প্রতিকূল শক্তি। এইরকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চারি দিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা রাজবংশে সাম্রাজ্যভার অতি দীর্ঘকাল বহন করবার শক্তি টিঁকে থাকতেই পারে না। কেননা সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক, যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই, জবর্দস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহু-বিস্তৃত সীমানা বহুবিচিত্র বিবাদের সংস্রবে আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরুভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজাণ্ডারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেকজান্দার নয়। অতি বৃহদাকার প্রতাপের দুর্ভর ভার বাহকেরা একদিন নিশ্চিত বর্জন করতে বাধ্য, ভগ্ন-ঊরু ধূলিশায়ী মৃত দুর্যোধনের মতো ভগ্নাবশিষ্ট পর্সিপোলিস এই তত্ত্ব আজ বহন করছে। আলেকজান্দারের জোড়াতাড়া-দেওয়া সাম্রাজ্যও অল্পকালের আয়ু নিয়েই সেই তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে কথা সুবিদিত।

এখান থেকে আর এক ঘণ্টার পথ গিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন। একটি বড়ো রকমের গ্রাম, পথের দুই ধারে ঘনসংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডান পাশে মাটি ছেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় করে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্‌ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হল। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।

আকাশে মেঘ জমে আসছে। এখান থেকে নব্বই মাইল পরে আবাদে-নামক ছোটো শহর, সেখানে রাত্রিযাপনের কথা। দূরে দেখা যাচ্ছে তুষাররেখার-তিলক-কাটা গিরিশিখর। দেহ্‌বিদ গ্রাম ছাড়িয়ে সুর্মাকে পৌঁছলুম। পথের মধ্যে সেখানকার প্রধান রাজকর্মচারী অভ্যর্থনা জানিয়ে আগে চলে গেলেন। বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছলুম পুরপ্রাসাদে। কাল ভোরের বেলা রওনা হয়ে ইস্ফাহানে পৌঁছব দ্বিপ্রহরে।

যারা খাঁটি ভ্রমণকারী তারা জাতই আলাদা। এক দিকে তাদের শরীর মন চিরচলিষ্ণু, আর-এক দিকে অনভ্যস্তের মধ্যে তাদের সহজ বিহার। যারা শরীরটাকে স্তব্ধ রেখে মনটাকে চালায় তারা অন্য শ্রেণীর লোক। অথচ রেলগাড়ি-মোটরগাড়ির মধ্যস্থতায় এই দুই জাতের পঙ্‌ক্তিভেদ রইল না। কুনো মানুষের ভ্রমণ আপন কোণ থেকে আপন কোণেই আসবার জন্যে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভাষায় যাদের বলে কনিষ্ঠ অধিকারী। তারা বাঁধা রাস্তায় সস্তায় টিকিট কেনে, মনে করে মুক্তিপথে ভ্রমণ সারা হল, কিন্তু ঘটা করে ফিরে আসে সেই আপন সংকীর্ণ আড্ডায়, লাভের মধ্যে, হয়তো সংগ্রহ করে অহংকার।

ভ্রমণের সাধনা আমার ধাতে নেই, অন্তত এই বয়সে। সাধক যারা, দুর্গমতার কৃচ্ছ্রসাধনে তাদের স্বভাবের আনন্দ, পথ খুঁজে বের করবার মহৎ ভার তাদের উপর। তারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, ভ্রমণের চরম ফল তারাই পায়। আমি আপাতত মোটরে চড়ে চললেম ইস্ফাহানে।

সকালবেলা মেঘাচ্ছন্ন, কাল বিকেল থেকেই তার আয়োজন। আজ শীত পড়েছে রীতিমত। একঘেয়ে শূন্যপ্রায় প্রান্তরে আসন্ন বৃষ্টির ছায়া বিস্তীর্ণ। দিগন্ত বেষ্টন করে যে গিরিমালা, নীলাভ অস্পষ্টতায় সে অবগুণ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি অন্তহীন, আলের-চিহ্ন-হীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়। চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না। হাটের দিন হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের খেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায় ওই দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও

মানুষের নানাদ্বন্দ্ববিঘট্টিত সংসারযাত্রা চলেছে। মাঠে কোথাও-বা ফসল, কোথাও-বা বহুদূর ধরে আগাছা, তাতে ঊর্ধ্বপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোটো নদী, কিন্তু তাকে আঁকড়ে নেই গ্রাম। মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরুবাছুর জল খায় না ; নির্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলে-ঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই। আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে, আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারি দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্যে কাঠের-তক্তা-ফেলা সংকীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজদিখস্ত্।

দুপর বেজেছে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন করে মোটর-রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। সেই কাব্যটির ইংরেজি তর্জমা এইখানে লিখে দিই :

The caravans of India always carry sugar but this time it has the perfume of the muse. O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee like the butterflies which burn around the flame of candles.

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi will come to life in his tomb.

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the future holds.

Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus, an august descendant of whom to-day fortunately wears the crown of Persia.

পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্ পপ্‌লার অলিভ ও তুঁত গাছের শ্রেণী। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূরপ্রসারিত ইস্ফাহান শহর।

৬

পূর্বেই বলে রেখেছিলুম, আমি সম্মাননা চাই নে, আমাকে যেন একটি নিভৃত জায়গায় যথাসম্ভব শান্তিতে রাখা হয়। উপর থেকে সেইরকম হুকুম এসেছে। তাই এসেছি একটি বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়ি বললে একে খাটো করা হয়। এ একটি

মস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। যিনি গবর্নর তিনি ধীর সুগম্ভীর, শান্ত তাঁর সৌজন্য, এঁর মধ্যে প্রাচ্যপ্রকৃতির মিতভাষী অচঞ্চল আভিজাত্য।

শুনতে পাই এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমাদের দেশের সেকেলে কোনো কোনো ডাকাতে জমিদারদের মতো ছিলেন। একদা এখানে সশস্ত্রে সসৈন্যে অনেক দৌরাত্ম্য করেছেন। এখন অস্ত্র সৈন্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তেহেরানে রাখা হয়েছে, কারাবন্দীরূপে নয়, নজরবন্দীরূপে। তাঁর ছেলেদের য়ুরোপে শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। ভারত গবর্মেণ্টের শাসননীতির সঙ্গে কিছু প্রভেদ দেখছি। মোহ্‌মেরার শেখ, গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করাতে রাজা সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তখন শেখ সন্ধির প্রার্থনা করতেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। এখন তিনি তেহেরানে বাসা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি নজর রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁস বা হাতে শিকল চড়ে নি।

অপরাহ্ণে যখন শহরে প্রবেশ করেছিলুম তখন ক্লান্ত দৃষ্টি শ্রান্ত মন ভালো করে কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। আজ সকালে নির্মল আকাশ, স্নিগ্ধ রৌদ্র। দোতলার একটি কোণের বারান্দায় বসেছি। নীচের বাগানে এল্‌ম্‌ পপ্‌লার উইলো গাছে বেষ্টিত ছোটো জলাশয় ও ফোয়ারা। দূরে গাছপালার মধ্যে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে, যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, সুচিক্কণ নীল পারসিক টালি দিয়ে তৈরি, এই সকালবেলাকার পাতলা মেঘে-ছোঁওয়া আকাশের চেয়ে ঘনতর নীল। সামনেকার কাঁকর-বিছানো রাস্তায় সৈনিক প্রহরী পায়চারি করছে।

এ-পর্যন্ত সমস্ত পারস্যে দেখে আসছি এরা বাগানকে কী ভালোই না বাসে। এখানে চারি দিকে সবুজ রঙের দুর্ভিক্ষ, তাই চোখের ক্ষুধা মেটাবার এই আয়োজন। বাবর ভারতবর্ষে বাগানের অভাব দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মরুপ্রদেশ থেকে, বাগান তাঁদের পক্ষে শুধু কেবল বিলাসের জিনিস ছিল না, ছিল অত্যাবশ্যক। তাকে বহুসাধনায় পেতে হয়েছে বলে এত ভালোবাসা। বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার শাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারি দিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই-কাঁথায় রঙ ফলে ওঠে নি, লতাপাতার রঙিন ছাপ-ওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রঙ লাগায় মারোয়াড়ি, বাঙালি লাগায় না।

আজ সকালবেলায় স্নান করবার অবকাশ রইল না। একে একে এখানকার ম্যুনিসিপালিটি, মিলিটারি-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বণিক্‌সভা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন।

বেলা তিনটের পর শহর পরিক্রমণে বেরলুম। ইস্পাহানের একটি বিশেষত্ব আছে, সে আমার চোখে সুন্দর লাগল। মানুষের বাসা প্রকৃতিকে একঘরে করে রাখে নি, গাছের প্রতি তার ঘনিষ্ঠ আনন্দ শহরের সর্বত্রই প্রকাশমান। সারিবাঁধা গাছের তলা দিয়ে দিয়ে জলের ধারা চলেছে, সে যেন মানুষেরই দরদের প্রবাহ। গাছপালার সঙ্গে নিবিড় মিলনে নগরটিকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ বলে চোখে ঠেকে। সাধারণত উড়ো-জাহাজে চড়ে শহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্মরোগ।

মানুষের নিজের হাতের আশ্চর্য কীর্তি আছে এই শহরের মাঝখানে, একটি বৃহৎ ময়দান ঘিরে। এর নাম ময়দান-ই-শা অর্থাৎ বাদশাহের ময়দান। এখানে এক কালে বাদশাহের পোলো খেলবার জায়গা ছিল। এই চত্বরের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ-ই-শা। প্রথম শা আব্বাসের আমলে এর নির্মাণ আরম্ভ, আর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শা আব্বাসের সময়ে তার সমাপ্তি। এখন এখানে ভজনার কাজ হয় না। বর্তমান বাদশাহদের আমলে বহুকালের ধুলো ধুয়ে একে সাফ করা হচ্ছে। এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সযত্নসুন্দর, এর কারুকার্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্তী আর-একটি মসজিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগে প্রবেশ করলুম। এক দিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় এ সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর-এক দিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণসংগতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণ, সেখানে প্রাচীন চেনার গাছ এবং তুঁত, দক্ষিণ ধারে অত্যুচ্চ-গুম্বজওয়ালা সুপ্রশস্ত ভজনাগৃহ। যে টালিতে ভিত্তি মণ্ডিত তার কোথাও কোথাও চিক্কণ পাতলা বর্ণপ্রলেপ ক্ষয়প্রাপ্ত, কোথাও-বা পরবর্তীকালে টালি বদল করতে হয়েছে, কিন্তু নূতন যোজনাটা খাপ খায় নি। আগেকার কালের সেই আশ্চর্য নীল রঙের প্রলেপ এ কালে অসম্ভব। এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদার গাম্ভীর্য। অনাদর-অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন কোথাও নেই। সর্বত্র একটি সসম্ভ্রম সম্মান যথার্থ শুচিতা রক্ষা করে বিরাজ করছে।

এই মসজিদের প্রাঙ্গণে যাদের দেখলেম তাদের মোল্লার বেশ। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, হয়তো মনে মনে প্রসন্ন হয় নি। শুনলুম আর দশ বছর আগে এখানে আমাদের প্রবেশ সম্ভবপর হত না। শুনে আমি যে বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ, আর বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।

শহরের মাঝখান দিয়ে বালুশয্যার মধ্যে বিভক্ত-ধারা একটি নদী চলে গেছে। তার নাম জই আন্দেরু, অর্থাৎ জন্মদায়িনী। এই নদীর তলদেশে যেখানে থোঁড়া

যায় সেখান থেকেই উৎস ওঠে, তাই এর এই নাম— উৎসজননী। কলকাতার ধারে গঙ্গা যেরকম ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খলজর্জর, এ সেরকম নয়। গঙ্গাকে কলকাতা কিংকরী করেছে, সখী করে নি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য। এখানকার এই পুরবাসিনী নদী গঙ্গার তুলনায় অগভীর ও অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু এর স্বচ্ছ সৌন্দর্য নগরের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে আনন্দ বহন করে।

এই নদীর উপরকার একটি ব্রিজ দেখতে এলুম, তার নাম আলিবর্দী-খাঁর পুল। আলিবর্দী শা-আব্বাসের সেনাপতি, বাদশার হুকুমে এই পুল তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীতে আধুনিক ও প্রাচীন অনেক ব্রিজ আছে, তার মধ্যে এই কীর্তিটি অসাধারণ। বহুখিলানওয়ালা তিন-তলা এই পুল; শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে বলে এ তৈরি হয় নি— অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ নয়, এও স্বয়ং লক্ষ্য। এ সেই দিলদরিয়া যুগের রচনা যা আপনার কাজের তাড়াতেও আপন মর্যাদা ভুলত না।

ব্রিজ পার হয়ে গেলুম এখানকার আর্মানি গির্জায়। গির্জার বাহিরে ও অঙ্গনে ভিড় জমেছে।

ভিতরে গেলেম। প্রাচীন গির্জা। উপাসনা-ঘরের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত, অলংকৃত। দেয়ালের নীচের দিকটায় সুন্দর পারসিক টালির কাজ, বাকি অংশটায় বাইবেল-বর্ণিত পৌরাণিক ছবি আঁকা। জনশ্রুতি এই যে, কোনো ইটালিয়ন চিত্রকর ভ্রমণ করতে এসে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

তিনশো বছর হয়ে গেল, শা-আব্বাস রুশিয়া থেকে বহু সহস্র আর্মানি আনিয়ে ইস্পাহানে বাস করান। তারা কারিগর ছিল ভালো। তখনকার দেশবিজয়ী রাজারা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে শিল্পীদেরও লুঠ করতে ছাড়তেন না। শা-আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ হল। অবশেষে নাদির শাহের আমলে উপদ্রব এত অসহ্য হয়ে উঠল যে টিঁকতে পারলে না। সেই সময়েই আর্মানিরা প্রথম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। বর্তমান বাদশাহের আমলে তাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সে কালে কারুনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাদের যে খ্যাতি ছিল এখন তার আর কিছু বাকি আছে বলে বোধ হল না।

বাজারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। আজ কী-একটা পরবে দোকানের দরজা সব বন্ধ। এখানকার সুদীর্ঘ চিনার-বীথিকায় গিয়ে পড়লুম। বাদশাহের আমলে এই রাস্তার মাঝখান দিয়ে টালি-বাঁধানো নালায় জল বইত, মাঝে মাঝে খেলত ফোয়ারা, আর ছিল ফুলের কেয়ারি। দরকারের জিনিসকে করেছিল আদরের জিনিস; পথেরও ছিল আমন্ত্রণ, আতিথ্য।

ইস্পাহানের ময়দানের চারি দিকে যে-সব অত্যাশ্চর্য মসজিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই রচনা যে যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয়, মানুষের মনের পরিমাপে। তখন এক-একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন সর্বসাধারণের প্রতিনিধি। ভূতলসৃষ্টির আদিকালে ভূমিকম্পের বেগে যেমন বড়ো পাহাড় উঠে পড়েছিল তেমনি। এই পাহাড়কে সংস্কৃত ভাষায় বলে ভূধর, অর্থাৎ সমস্ত ভূমিকে এই এক-একটা উচ্চচূড়া দৃঢ় ক'রে ধারণ করে এইরকম বিশ্বাস। তেমনি মানবসমাজের আদিকালে এক-একজন গণপতি সমস্ত মানুষের বল আপনার মধ্যে সংহত করে জনসাধারণকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাতে সর্বসাধারণ আপনার সার্থকতা দেখে আনন্দ পেত। তাঁরা একলাই যেমন সর্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেমনি তাঁদেরই মধ্যে সর্বজনের গৌরব, বহুজনের কাছে বহুকালের কাছে তাঁদের জবাবদিহি। তাঁদের কীর্তিতে কোনো অংশে দারিদ্র্য থাকলে সেই অমর্যাদা বহুলোকের, বহুকালের। এইজন্যে তখনকার মহৎ ব্যক্তির কীর্তিতে দুঃসাধ্যসাধন হয়েছে। সেই কীর্তি এক দিকে যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যে বড়ো তেমনি সর্বজনীনতায়। মানুষ আপন প্রকাশে বৃহতের যে কল্পনা করতে ভালোবাসে তাকে আকার দেওয়া সাধারণ লোকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এইজন্য তাকে উপযুক্ত আকারে প্রকাশ দেবার ভার ছিল নরোত্তমের, নরপতির। রাজা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে, কিন্তু বস্তুত সে প্রাসাদ সমস্ত প্রজার— রাজার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রজা সেই প্রাসাদের অধিকারী। এইজন্যে রাজাকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে মহাকায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। পর্সিপোলিসে দরিয়ুস রাজার রাজগৃহে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেটা দেখে মনে হয়, কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের পক্ষে সে নিতান্ত অসংগত। বস্তুত একটা বৃহৎ যুগ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল— সে যুগে সমস্ত মানুষ এক-একটি মানুষে অভিব্যক্ত।

পর্সিপোলিসের যে কীর্তি আজ ভেঙে পড়েছে তাতে প্রকাশ পায়, সেই যুগ গেছে ভেঙে। এরকম কীর্তির আর পুনরাবর্তন অসম্ভব। যে প্রান্তরে আজকের যুগ চাষ করছে, পশু চরাচ্ছে, যে পথ দিয়ে আজকের যুগ তার পণ্য বহন করে চলেছে, সেই প্রান্তরের ধারে, সেই পথের প্রান্তে এই অতিকায় স্তম্ভগুলো আপন সার্থকতা হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু মনে হয়, দৈবাৎ যদি না ভেঙে যেত তবু আজকেকার সংসারের মাঝখানে থাকতে পেত না। যেমন আছে অজন্তার গুহা, আছে তবু নেই। ওই ভাঙা থামগুলো সেকালের একটা সংকেতমাত্র নিয়ে আছে, ব্যতিব্যস্ত বর্তমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

সেই সংকেতের সমস্ত সুমহৎ তাৎপর্য অতীতের দিকে। নীচের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ইতরের মতো গর্জন করে চলেছে মোটর-রথ। তাকেও অবজ্ঞা করা যায় না, তার মধ্যেও মানবমহিমা আছে। কিন্তু এরা দুই পৃথক জাত, সগোত্র নয়। একটাতে আছে সর্বজনের সুযোগ, আর-একটাতে আছে সর্বজনের আত্মশ্লাঘা। এই শ্লাঘার প্রকাশে আমরা দেখতে পেলুম সেই অতীতকালের মানুষ কেমন করে প্রবল ব্যক্তি-স্বরূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এক-একটি বিরাট আকারে আপনাকে দেখতে চেয়েছে। প্রয়োজনের পরিমাপে সে আকারের মূল্য নয়, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিকেই বলে ঐশ্বর্য— সেই ঐশ্বর্যকে তার অসামান্যরূপে মানুষ দেখতে পায় না, যদি কোনো প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপন শক্তিকে উৎসৃষ্ট করে এই ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করা না হয়। নিজের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিদিন খরচ হয়ে যায়, সেই দিনযাত্রা প্রয়োজনের-অতীত মাহাত্ম্যকে বাঁধতে পারে না। সেই ঐশ্বর্য-যুগ, যে ঐশ্বর্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত, এখন চলে গেছে। তার সাজসজ্জা সমারোহভার এখনকার কাল বহন করতে অস্বীকার করে। অতএব সেই যুগের কীর্তি এখনকার চলতি কালকে যদি চেপে বসে তবে এই কালের অভিব্যক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মানুষের প্রতিভা নবনবোন্মেষে, কোনো একটামাত্র আবির্ভাবকেই দীর্ঘায়িত করার দ্বারা নয়, সে আবির্ভাব যতই সুন্দর যতই মহৎ হোক। মাদুরার মন্দির, ইস্পাহানের মসজিদ প্রাচীন কালের অস্তিত্বের দলিল— এখনকার কালকে যদি সে দখল করে তবে তাকে জবরদখল বলব। তারা যে সজীব নয় তার প্রমাণ এই যে, আপন ধারাকে আর তারা চালনা করতে পারছে না। বাইরে থেকে তাদের হয়তো নকল করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে তাদের নূতন সৃষ্টির আবেগ ফুরিয়ে গেছে।

এদের কৈফিয়ত এই যে, এরা যে ধর্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম ধর্মের বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে-সমস্ত ইঁটকাঠ নিয়ে সেই-সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্য কালের আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এক কালের ইতিহাসকে অন্য কালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরাকালের কোনো একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিত্যশক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই

জনসাধারণের আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূজার-ভার, তাদের স্বাধীন শক্তি থেকে হরণ করে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, অথচ চির-কালের মতো বাঁধা মতের ধর্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে রেখে দেবে— এ আর চলবে না। এই কারণে এইরকম সাম্প্রদায়িক ধর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে; বয়স উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মতো অপদার্থ হয়ে থাকবে।

প্রাচীন কীর্তি টিঁকে থাকবে না এমন কথা বলি নে। থাক্— কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহনরূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যাণ্ডিনেবীয় সাগা— তাকে কাব্য বলে স্বীকার করব, ধর্মগ্রন্থ বলে ব্যবহার করব না। যেমন আছে প্যারাডাইস লস্ট্— তাকে ভোগ কর্‌বার জন্যে, মানবার জন্যে নয়। য়ুরোপে পুরাতন ক্যাথিড্রাল আছে অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যযুগীয় যে ধর্মবোধ থেকে তার উদ্ভব ভিতরে ভিতরে তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘাট আছে, জল গেছে সরে। সে ঘাটে নৌকো বেঁধে রাখতে বাধা নেই, কিন্তু সে নৌকোয় খেয়া চলবে না। যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধিবিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্তন চলছেই; মানুষের মন সেইসঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্মকে শোধন করে না নেয় তা হলে ধর্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এইজন্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতে আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে; আর তার সর্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর-কোথাও নয়।

এসঙ্গে এ কথাও আমার মনে এসেছে যে মনুর পরামর্শ ছিল ভালো। সংসারের ধর্মই হচ্ছে সে সরে সরে যায়, অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে সরতে পারে না সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত— যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্তি সব। যদি তারা নিজের যুগকে

পূর্ণতা দিয়ে থাকে তবে তাদের মূল্য আছে, কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ একটা জায়গায় স্থিরত্বে ঠেকেছে বলেই তাকে দিয়ে আমরা পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছলতা কতদূর উঠল সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনি মানুষের কীর্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা আমাদের অন্য কোনো কাজ না হোক আদর্শরচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না, শক্তির মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতনকালের বৃদ্ধ যদি সেই আদর্শের কাজে লাগে তা হলে নূতনকালেও সে সার্থক। কিন্তু যদি সে নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্তিত করবে বলে পণ করে বসে তবে সে আবর্জনা সৃষ্টি করবে।

অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ চিত্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফুলের বা ফলের পালা যখন ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তাকে বর্জন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু সে যদি বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান। এইজন্যে মনুর কথা মানি— পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ। স্বাধীন শক্তিতে চিন্তা করা, প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করার দ্বারাই মানুষের মনোবৃত্তি সুস্থ ও বীর্যবান থাকে। যারা সত্যই জরায়-পাওয়া তারা সমাজের সেই নূতন অধ্যবসায়ী পরীক্ষাপরায়ণ প্রশ্নরত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে নষ্ট না করুক, বাধা না দিক, মনুর এই ছিল অভিপ্রায়। পৃথিবীতে যে সমাজ তরুণ বৃদ্ধ বা প্রবীণ বৃদ্ধের অধিকৃত সে সমাজ পঙ্গু; বৃদ্ধের কর্মশক্তি অস্বাভাবিক, অতএব সে কর্ম স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের মনের সক্রিয়তা স্বভাবের নিয়মে বাইরের দিক থেকে সরে এসে অন্তরের দিকে পরিণত হতে থাকে। তাই তাদের নিজের সার্থকতার জন্যেও অভিভাবকের পদ ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে নিভৃতে যাওয়াই কর্তব্য— তাতে ক্ষতি হবে এ কথা মনে করা অহংকার মাত্র।

আজ ছাব্বিশে। পনেরো দিন মাত্র দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হয়ে গেল। ভেবে দেখলুম, তার কারণ এ নয় যে, অনভ্যস্ত প্রবাসবাসের দুঃখ সময়কে চিরায়মান করেছে। আসল কথা এই যে, দেশে থাকি নিজের সঙ্গে নিতান্ত নিকটে আবদ্ধ বহু খুচরো কাজের ছোটো ছোটো সময় নিয়ে।

এখানে অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ও নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি। ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত ঊর্ধ্বে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায় তেমনি নিজের সুখদুঃখের-জালে বদ্ধ, প্রয়োজনের-স্তূপে-আচ্ছন্ন সময় থেকে দূরে এলে অনেকখানি সময়কে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তখন যেন দিনকে দেখি নে, যুগকে দেখি ; দেখি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়— খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে নয়।

গবর্নরের ব্যবস্থায় এ দুইদিন রাত্রির আহারের পর ঘণ্টাখানেক ধরে এখানকার সংগীত শুনতে পাই। বেশ লাগে। টার বলে যে তারের যন্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মৃদুধ্বনি থেকে প্রবল ঝংকার পর্যন্ত তার গতিবিধি। তাল দেবার যন্ত্রটাকে বলে ডম্বক, তার বোলের আওয়াজে আমাদের বাঁয়া-তবলার চেয়ে বৈচিত্র্য আছে।

ইস্পাহানে আজ আমার শেষদিন, অপরাহ্ণে পুরসভার তরফ থেকে আমার অভ্যর্থনা। যে প্রাসাদে আমার আমন্ত্রণ সে শা আব্বাসের আমলের, নাম চিহিল সতুন। সমুচ্চ পাথরের স্তম্ভশ্রেণীবিরাজিত এর অলিন্দ, পিছনে সভামণ্ডপ, তার পিছনে প্রশস্ত একটি ঘর— দেয়ালে বিচিত্র ছবি আঁকা। এক সময়ে কোনো-এক কদুৎসাহী শাসনকর্তা চুনকাম করে সমস্তটা ঢেকে দিয়েছিলেন। হাল আমলে ছবিগুলিকে আবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

এখানকার কাজ শেষ হল।

দৈবাৎ এক-একটি শহর দেখতে পাওয়া যায় যার স্বরূপটি সুস্পষ্ট, প্রতি মুহূর্তে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইস্পাহান সেইরকম শহর। এটি পারস্যদেশের একটি পীঠস্থান। এর মধ্যে বহুযুগের, শুধু শক্তি নয়, প্রেম সজীব হয়ে আছে।

ইস্পাহান পারস্যের একটি অতি প্রাচীন শহর। একজন প্রাচীন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় সেলজুক-রাজবংশীয় সুলতান মহম্মদের মাদ্রাসা ও সমাধির সম্মুখে তখন একটি প্রকাণ্ড দেবমূর্তি পড়ে ছিল। কোনো-একজন সুলতান ভারতবর্ষ থেকে এটি এনেছিলেন। তার ওজন ছিল প্রায় হাজার মণ।

দশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শা আব্বাস আর্দাবিল থেকে তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাফাবি-বংশীয় এই শা আব্বাস পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন স্মরণীয়-ব্যক্তি।

তিনি যখন সিংহাসনে উঠলেন তখন তাঁর বয়স ষোলো, ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। যুদ্ধবিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ। সমস্ত পারস্যকে একীকরণ এঁর মহৎকীর্তি। ন্যায়বিচারে দাক্ষিণ্যে ঐশ্বর্যে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর ঔদার্য ছিল অনেকটা দিল্লীশ্বর আকবরের মতো। তাঁরা এক সময়ের লোকও

ছিলেন। তাঁর রাজত্বে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন ছিল না। কেবল শাসন-নীতি নয়, তাঁর সময়ে পারস্যে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্বোচ্চসীমায় উঠেছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মহিমার অবসান। অবশেষে একদা তাঁর শেষ বংশধর শা সুলতান হোসেন পারস্যবিজয়ী সুলতান মামুদের আসনতলে প্রণতি করে বললেন, 'পুত্র, যেহেতু জগদীশ্বর আমার রাজত্ব আর ইচ্ছা করেন না, অতএব আমার সাম্রাজ্য এই তোমার হাতে সমর্পণ করি।'

এর পরে আফগান রাজত্ব। শাসনকর্তাদের মধ্যে হত্যা ও গুপ্তহত্যা এগিয়ে চলল। চারি দিকে লুটপাট ভাঙাচোরা। অত্যাচারে জর্জরিত হল ইস্পাহান।

অবশেষে এলেন নাদির শা। বাল্যকালে ছাগল চরাতেন; অবশেষে একদিন ভাগ্যের চক্রান্তে আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রাখাল চড়ে বসলেন শা আব্বাসের সিংহাসনে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্যন্ত উড়ল। স্বরাজ্যে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন বহুকোটি টাকা দামের লুটের মাল ও ময়ূরতক্ত সিংহাসন। শেষবয়সে তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে, আপন বড়োছেলের চোখ উপড়িয়ে ফেললেন। মাথায় খুন চড়ল। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে প্রাণ দিলেন তাঁর কোনো-এক অনুচরের ছুরির ঘায়ে; শেষ হয়ে গেল বিজয়ী রাজমহিমা অখ্যাত মৃত্যুশয্যায়।

তার পরে অর্ধশতাব্দী ধরে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখ-ওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়। কোথা থেকে এল কাজার-বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। খুন করে, লুঠ করে, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করে আপন পাশবিকতার চুড়ো তুললে কর্মান শহরে, নগরবাসীর সত্তর হাজার উৎপাটিত চোখ হিসাব করে গ'নে নিলে। মহম্মদ খাঁর দস্যুবৃত্তির চরমকীর্তি রইল খোরাসানে, সেখানে নাদির শাহের হতভাগ্য অন্ধ পুত্র শা-রুখ ছিল রাজা। হিন্দুস্থান থেকে নাদির শাহের বহুমূল্য লুঠের মাল গুপ্ত রাজকোষ থেকে উদ্গীর্ণ করে নেবার জন্যে দস্যুশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শা-রুখকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। অবশেষে একদিন শা-রুখের মুণ্ড ঘিরে একটা মুখোশ পরিয়ে তার মধ্যে সীসে গালিয়ে ঢেলে দিলে। এমনি করে শা-রুখের প্রাণ এবং ঔরঙ্গজেবের চুনি তার হস্তগত হল। তার পরে এশিয়ায় ক্রমে এসে পড়ল য়ুরোপের বণিকদল, ইতিহাসের আর-এক পর্ব আরম্ভ হল পূর্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠছিল তখন ওই কাজার-বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীয় ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্বল হাতের রাজদণ্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীয় তর্জনীসংকেতে।

এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা। পারস্যের জীর্ণ জর্জর রাষ্ট্রশক্তি সর্বত্র আজ উজ্জ্বল নবীন হয়ে উঠছে। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্পাহানকে দেখছি তার উপর থেকে অনেক দিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে। দেখা যায় এতকালের দুর্যোগে ইস্পাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে, তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুন নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ— আকেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকত তা হলে য়ুরোপের আঘাতে টুকরো টুকরো হতে দেরি হত না। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না; অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে, পারস্য এক।

পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। আকেমেনীয় যুগে পারস্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উদ্‌ভাবিত হল তার মধ্যে আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, ঈজিপ্‌টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন-কি, তখনকার প্রাসাদনির্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুলসাম্রাজ্যভুক্ত নানাদেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাব বিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের দ্বারা। রজার ফ্রাই এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এখানে উদ্‌ধৃত করি :

This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art. … We tend, perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an art; we admire in it the expression of an independent and self-contained people, forgetting that originality may arise from a want of flexibility in the artist's make-up as well as from a new imaginative outlook.

নানা প্রভাব চারি দিক থেকে আসে; জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত করে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে, তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার

প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটল। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বলপূর্বক ধর্মদীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করে নি। আরবশাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয় নি। পারস্যে ইসলাম ধর্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রবর্তিত হয়েছে। তৎপূর্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্তন করাতে রেখালংকার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তার পরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেইসঙ্গে তাদের বহুতর কীর্তি লণ্ডভণ্ড করে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই-সকল কীর্তিনাশার দল প্রথমে যত উৎপাত করুক, ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয় সাসানীয় আরবীয় সেলজুক মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্বে পর্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে, তবু লুপ্ত হয় নি, এরকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর-কোনো দেশে দেখা যায় না।

৭

২৯ এপ্রেল। ইস্ফাহান থেকে যাত্রা করা গেল তেহেরানের দিকে। নগরের বাহিরেও অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ খেত, গাছপালা ও জলের ধারা। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোথাও-বা তারা পরিত্যক্ত। মাটির প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি জীর্ণতার নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, ভিতের উপরে ছাদ নেই। এক জায়গায় এইরকম ভাঙা শূন্য গ্রামের সামনেই পথের ধারে পড়ে আছে উটের কঙ্কাল। ওই ভাঙা ঘরগুলো, আর ওই প্রাণীটার বুকের পাঁজর একই কথা বলছে। প্রাণের ভারবাহী যে-সব বাহন প্রাণহীন কিছুদিন তারাই থাকে বোবার মতো পড়ে, আর প্রাণ যায় চলে। এখানকার মাটির ঘর যেন মাটির তাঁবু— উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা, তার পরে তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি, এই তো ভালো। গড়ে তোলাও সহজ, ফেলে যাওয়াও তাই। বাসার সঙ্গে নিজেকে ও অপরিচিত আগামীকালকে বেঁধে রাখবার বিড়ম্বনা নেই। মানুষের কেবল যদি একটামাত্র দেহ থাকত বংশানুক্রমে সকলের জন্যে, খুব মজবুত চতুর্দন্ত হাতির হাড় আর গণ্ডারের সাত-পুরু চামড়া দিয়ে

খুব পাকা করে তৈরি চোদ্দ পুরুষের একটা সরকারি দেহ, যেটা অনেকজনের পক্ষে মোটামুটিভাবে উপযোগী, কিন্তু কোনো-একজনের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে উপযুক্ত নয়, নিশ্চয় সেই দেহদুর্গটা প্রাণপুরুষের পছন্দসই হত না। আপন বসতবাড়িকে বংশানুক্রমে পাকা করে তোলবার চেষ্টা প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। পুরানো বাড়ি আপন যুগ পেরতে না পেরতে পোড়োবাড়ি হতে বাধ্য। পিতৃপুরুষের অপব্যয়কে উপেক্ষা করে নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাসা করে। আশ্চর্য এই যে, সেও ভাবী ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি করবার জন্যে দশ পুরুষের মাপে অচল ভিত বানাতে থাকে। অর্থাৎ, মরে গিয়েও সে ভাবীকালকে জুড়ে আপন বাসায় বাস করবে এই কল্পনাতেই মুগ্ধ। আমার মনে হয়, যে-সব ইমারত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়, স্থায়িত্বকামী স্থাপত্য তাদেরই সাজে।

কিছু দূরে গিয়ে আবার সেই শূন্য শুষ্ক ধরণী, গেরুয়া চাদরে ঢাকা তার নিরলংকৃত নিরাসক্তি। মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছলুম দেলিজানে। ইস্ফাহানের গভর্নর এখানে তাঁবু ফেলে আমাদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। এই তাঁবুতে আমাদের আহার হল। কুমশহর এখান থেকে আরো কতকটা দূরে। তার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় স্বর্ণমণ্ডিত তার বিখ্যাত মসজিদের চূড়া।

বেলা পাঁচটার সময় গাড়ি পৌঁছল তেহেরানের কাছাকাছি। শুরু হল তার আত্মপরিচয়। নগরপ্রবেশের পূর্বে বর্তমানযুগের শৃঙ্গধ্বনিমুখর নকিবের মতো দেখা গেল একটা কারখানাঘর— এটা চিনির কারখানা। এরই সংলগ্ন বাড়িতে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনার জন্য নামালেন। ক্লান্তদেহের খাতিরে দ্রুত ছুটি নিতে হল। তার পরে তেহেরানের পৌরজনদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্য একটি বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করলেম। এখানকার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সভাপতি। এখানে চা খেয়ে স্বাগতসম্ভাষণের অনুষ্ঠান যখন শেষ হল সভাপতি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বৃহৎ বাগানবাড়িতে। নানাবর্ণ ফুলে খচিত তার তৃণ-আস্তরণ। গোলাপের গন্ধমাধুর্যে উচ্ছ্বসিত তার বাতাস, মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ফোয়ারা এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুশ্রেণীর বিচিত্র সমাবেশ। যিনি আমাদের জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেছেন তাকে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব এমন সুযোগ পাই নি। তাঁরই একজন আত্মীয় আগা আসাদি আমাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। ইনি ন্যুয়র্কের কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, আমার সমস্ত ইংরেজি রচনার সঙ্গে সুপরিচিত। অভ্যাগতবর্গের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সেতুস্বরূপ ছিলেন ইনি।

কয়েক দিন হল ইরাকের রাজা ফইসল এখানে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে এখানকার

সচিবেরা অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ অপরাহ্ণের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন বসে আছি ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজা বলে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁদের জানালেম, ভারতবর্ষে ফেরবার পথে বোগদাদে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন, আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ, কিন্তু ব্যাবসাদার নন। ব্যাবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়— ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে মেতে ওঠে, তা হলে সেই আতিশয্যে বস্তুগৌরব বাড়ে, রূপগৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃপুন পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে, রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাগরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্ধা তাকে মানায় না। এরকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেছেন সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগরাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা— সংগীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইঁটকাঠ-চুনসুরকিকে কণ্ঠ-কামানের মুখে সগর্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি-বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার-তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুশি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার

করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন, ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেশনকর্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না, কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের ; তা হোক গে, তবুও সেই ভালো লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।

ইতিমধ্যে একজন সেকেলে ওস্তাদ এসে আমাকে বাজনা শুনিয়ে গেছেন, তার থেকে বুঝলুম এখানেও গানের পথে সন্ধ্যা হয় এবং বাঘের ভয় ঘটে। এখানেও যে-খুশি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।

আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বললেই হয়। রাজার গায়ে খাকি-রঙের সৈনিক-পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিনমাত্র হল অতি দ্রুতহস্তে পারস্যরাজস্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার করে ইনি তার হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহদ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতিসহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার, না ছিল আভিজাত্যের দাবি ; তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হল। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েছেন কিন্তু সিংহাসনের চারি দিকে আশঙ্কা উদ্‌বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন অমিয় দেখে এসেছেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।

ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললুম, বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বললেন, যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাই নি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।

আমি যখন বললুম পারস্যের বর্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে, তিনি বললেন, রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে

প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর— এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল, কেননা আমরা জাতিতে ধর্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ এবং সম্যক উপযোগী করে তোলা।

আমি বললুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো বলে এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্‌ভাবিত হবে।

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্যটাই আমাদের দেশে সব প্রথম ও সব চেয়ে বেশি চাই, অথচ ওইটের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আর-একজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।

কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'আলো পাব কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে— কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে। সেই-সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাঁদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে, দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচারবিচারের কড়াক্কড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয় নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

৮

আজ এই যে তেহেরানের জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা।

সভা ভঙ্গ হলে আমাদের নিয়ে গেল এখানকার একজন সংগীতগুণীর বাড়িতে। ছোটো একটি গলির ধারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলুম। শানবাঁধানো চৌকো উঠোন, তারই মধ্যে একটুখানি জলাশয়, গোলাপ ধরেছে গাছে, ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সামনে দালান, সেখানে বাজিয়ের দল অপেক্ষা করছে। বাজনার মধ্যে একটি তারযন্ত্র, একটি বাঁশি, বাকি অনেকগুলি বেহালা। আমরা সেখানে আসন নিলে পর প্রধান গুণী বললেন, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করেন দেশপ্রচলিত কলাবিদ্যার স্বরূপ নষ্ট না হয়। আমরাও তাই চাই। সংগীতের স্বদেশী স্বকীয়তা রক্ষা করে আমরা তার সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরসংগতিতত্ত্ব যোগ করতে চেষ্টা করি।

আমি বললুম, ইতিহাসে দেখা যায় পারসিকদের গ্রহণ করবার প্রবলশক্তি আছে। এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তিসঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর—প্রবলতর হয়।

তার পরে তিনি একলা একটি সুর তাঁর তারযন্ত্রে বাজালেন। সেটি বিশুদ্ধ ভৈরবী, উপস্থিত সকলেরই সেটি অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইনি বললেন, জানি, এরকম সুর আমাদেরকে একভাবে মুগ্ধ করে, কিন্তু অন্যরকম জিনিসটারও বিশেষ মূল্য আছে। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা জন্মিয়ে দিয়ে একটার খাতিরে অন্যকে বর্জন করা নিজের লোকসান করা।

কী জানি, লোকটির যদি শক্তি থাকে তবে পারসিক সংগীতে ইনি যে নূতন বাণিজ্যের প্রবর্তন করছেন ক্রমে হয়তো কলারাজ্যে তা লাভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে। সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

আজ ৬ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারি দিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানা রকমের। এখানকার গবর্মেণ্ট থেকে একটি পদক ও সেইসঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের— আমি দ্বিজ।

অপরাহ্নে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর বাড়িতে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সভায় এ দেশের প্রধানগণ ও বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন পারসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে কথা উঠল, বহুকাল থেকে বারম্বার বিদেশী আক্রমণকারীদের, বিশেষত মোগল ও আফগানদের, হাত থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পারস্য যে আপন প্রতিভাকে সজীব রেখেছে এ অতি আশ্চর্য। তিনি বললেন, সমস্ত জাতিকে আশ্রয় করে পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারই ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েছে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্মস্বরূপকে রক্ষা করেছে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই পারস্যের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে— আরব থেকে আরম্ভ করে মোগল পর্যন্ত।

আরবরা তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারস্যকে ধর্ম দিয়েছে, কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন নানা বিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইসলামকে পারস্য ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।

৭ মে। আজ সকালে প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড বড়ো বৈঠকখানা, স্ফটিকে মণ্ডিত, কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে। মন্ত্রী বৃদ্ধ, আমারই সমবয়সী। আমি তাঁকে বললুম ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের জীবনযাত্রার উপরে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি মাশুল চড়িয়েছে।

তিনি বললেন, বয়সের উপর কালের দাবি তত বেশি লোকসান করে না যেমন করে আহারে ব্যবহারে অনিয়ম অসংযম। সাবেক কালে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসগুলি ছিল আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই, এখন বিদেশী নতুন অভ্যাস এসে অসামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। ঘরে কার্পেট পাতা আমাদের চিরকালের অভ্যাস, তারই সঙ্গে জুড়ি অভ্যাস হচ্ছে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। আজকাল য়ুরোপীয় প্রথামত পথের জুতোটাকে ধুলোসুদ্ধ ঘরের মধ্যে টেনে আনি। কার্পেট হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। আগে কার্পেট-পাতা মেঝের উপর বসতুম, এখন সোফা-কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।

এখান থেকে গেলেম পার্লামেন্টের সভানায়কের বাড়িতে। এঁরা চিন্তাশীল শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক, এঁদের সঙ্গে কথা কইবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু কথা চলে না। তর্জমার ভিতর দিয়ে আলাপ করা পায়ে পায়ে কোদালি দিয়ে পথ কেটে চলার মতো। যিনি আমার কালকেকার কবিতা[১] পারসিক ভাষা ও ছন্দে তর্জমা করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। লোকটি হাসিখুশি, গোলগাল, হৃদ্যতায় সমুচ্ছ্বসিত। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবল কণ্ঠে, প্রবল উৎসাহে দেহচালনা করেন। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সভাপতিমশায় অতি সুন্দর লিপিনৈপুণ্যে লিখিত কবি আনওয়ারির রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন।

রাত্রে গেলেম থিয়েটারে অভিনয় দেখতে। নাটক এবং নাট্যাভিনয় পারস্যে হালের আমদানি। এখনো লোকের মনে ভালো করে বসে নি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচা রকমের ঠেকল। শাহ্‌নামা থেকে নাটকের গল্পটি নেওয়া। আমাদের দেশের নাটকের মতো প্রায়ই মাঝে মাঝে গান, এবং বোধ করি দেশাভিমানের উচ্ছ্বাস। মেয়েদের ভূমিকা অধিকাংশই মুসলমান মেয়েরা নিয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ হল।

অপরাহ্ণে জরথুস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান। সেখান থেকে কর্তব্য সেরে ফিরে যখন এলুম তখন আমাদের বাগানে গাছের তলায় একটি জলাশয়ের চার ধারে

১ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করছে। এখানকার সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণে সকলে আহূত। আমার তরফে ছিল সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতার ধারা, আর এঁদের তরফে ছিল তারই মাঝে মাঝে এপারে ওপারে পারসিক ভাষার সাঁকো বেঁধে দেওয়া।

পথিকের মতো পথ চলতে চলতে আমি আজ এখানকার ছবি দেখতে দেখতে চলেছি। সম্পূর্ণ করে কিছু দেখবার সময় নেই। আমার মনে যে ধারণাগুলো হচ্ছে সে দ্রুত আভাসের ধারণা। বিচার করে উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র মানসিক হাত বুলিয়ে যাবার অনুভূতি। এই যেমন, সেদিন একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ অল্পক্ষণের আলাপ হল। একটা ছায়াছবি মনে রয়ে গেল, সেটা নিমেষকালের আলোতে তোলা। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক। সৌম্য তাঁর মূর্তি, মুখে স্বচ্ছচিত্তের প্রকাশ। এঁর বেশ মোল্লার, কিন্তু এঁর বুদ্ধি সংস্কারমোহমুক্ত, ইনি আধুনিক অথচ চিরকালের পারসিক। ক্ষণকালের দেখাতেই এই মানুষের মধ্যে আমি পারস্যের আত্মসমাহিত স্বপ্রকৃতিস্থ মূর্তি দেখলুম, যে পারস্যে একদা আবিসেন্না ছিলেন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধক এবং জালালউদ্দিন গভীরতম আত্মোপলব্ধিকে সরসতম সংগীতে প্রবাহিত করেছিলেন। অধ্যাপক ফেরুঘির কথা পূর্বেই বলেছি। তিনিও আমার মনে একটি চিত্র এঁকে দিয়েছেন, সে চিত্রও চিত্তবান পারসিকের। অর্থাৎ এঁর স্বদেশীয় স্বভাব বিদেশীর কাছেও সহজে প্রকাশমান। যে মানুষ সংকীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না, কেননা, মূর্তি আপন দেশের মাটিতে গড়া হলেও যে আলো তাকে প্রকাশ করবে সে আলো যে সার্বভৌমিক।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল, প্রধান মন্ত্রীবর্গ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

৯

বেলা আড়াইটার সময় যাত্রা করলুম। তেহেরান থেকে বেরিয়ে প্রথমটা পারস্যের নীরস নির্জন চেহারা আবার দেখা দিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দৃশ্যপরিবর্তন হল। ফসলে সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তরুসংহতি, যেখানে-সেখানে জলের চঞ্চল ধারা, মেটে ঘরের গ্রাম তেমন বিরল নয়। দিগন্তে বরফের আঙুল-বুলানো গিরিশিখর।

সূর্যাস্তের সময় কাজবিন শহরে পৌঁছলুম। এখানে একটি হোটেলে আমাদের

জায়গা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথের প্রধান জংশন যেমন আসানসোল, এখানে নানা পথের মোটরের সংগমতীর্থ তেমনি কাজবিন।

কাজবিন সাসানীয় কালের শহর, দ্বিতীয় শাপুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সাফাবি রাজা তামাস্প এই শহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লির পলাতক মোগল বাদশা হুমায়ুন দশবৎসরকাল এখানে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন।

সাফাবি বংশের বিখ্যাত শা আব্বাসের সঙ্গে অ্যান্টনি ও রবার্ট্ শার্লি -নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতার এইখানেই দেখা হয়। জনশ্রুতি এই যে, এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্রসহযোগে আধুনিককালীন যুদ্ধবিদ্যায় বাদশাহের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। যাই হোক, বর্তমানে এই ছোটো শহরটিতে সাবেক কালের রাজধানীর মর্যাদা কিছুই চোখে পড়ে না।

ভোরবেলা ছাড়লুম হামাদানের অভিমুখে। চড়াইপথে চলল আমাদের গাড়ি। দুই ধারে ভূমি সুজলা সুফলা, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গ্রাম, আঁকাবাঁকা নদী, আঙুরের খেত, আফিমের পুষ্পোচ্ছ্বাস। বেলা দুপুরের সময় হামাদানে পৌঁছিয়ে একটি মনোহর বাগানবাড়ির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল— পপ্লার-তরুসংঘের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফের-আঁচড়-কাটা পাহাড়।

তেহেরানে গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, এখানে ঠাণ্ডা। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এ শহর ছ-হাজার ফুট উঁচু। এল্‌ভেন্দ পাহাড়ের পাদদেশে এর স্থান। একদা আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এইখানে। সেই রাজধানীর প্রাচীন নাম ইতিহাসবিখ্যাত একবাতানা, আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলবেলা শহর দেখতে বেরলুম। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল ঘনবনের মধ্য দিয়ে গলিপথ বেয়ে একটি পুরোনো বড়ো ইমারতের সামনে। বললে, এর উপরের তলা থেকে চারি দিকের দৃশ্য অবারিত দেখতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গীরা দেখতে গেলেন, কিন্তু আমার সাহস হল না। গাড়িতে বসে দেখতে লাগলুম একদল লোক এসেছে বনের ধারে চড়িভাতি করতে। মেয়েরাও তার মধ্যে আছে; তারা কালো চাদরে মোড়া; কিন্তু দেখছি বাইরে বেরতে রাস্তায় ঘাটে বেড়াতে এদের সংকোচ নেই।

আজ মহরমের ছুটি, সবাই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েক বছর আগে মহরমের ছুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠত, আত্মপীড়নের তীব্রতায় মারা যেত কত লোক। বর্তমান রাজার আমলে ধীরে ধীরে তার তীব্রতা কমে আসছে।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে শহরে গেলেম। আজ দোকান বাজার বন্ধ, কিন্তু ছুটির দলের খুব ভিড়। পারস্যে এসে অবধি মানুষ কম দেখা আমাদের অভ্যাস, তাই রাস্তায় এত লোক আমাদের চোখে নতুন লাগল। আরো নতুন লাগল এই শহরটি। শহরের এমন চেহারা আর-কোথাও দেখি নি। মাঝখান দিয়ে একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালী ঝরনা নানা ভঙ্গিতে কলশব্দে বহমান— কোথাও-বা উপর থেকে নীচে পড়ছে ঝরে, কোথাও-বা তার সমতলী স্রোত রৌদ্রে ঝলমল করছে, ধারে ধারে পাথরের স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাঁকো এপার থেকে ওপারে; ঝর্নার সঙ্গে পথের আঁকাবাঁকা মিল; মানুষের কাজের সঙ্গে প্রকৃতির গলাগলি; বাড়ির সামিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি উপরের থাকে, নীচের থাকে, এ কোণে, ও কোণে। তারই নানা জায়গায় নানা দল বসে গেছে। বাঁকাচোরা রাস্তায় মোটরগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এমন-কি, মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটি-সম্ভোগীর দল। গাড়ির ঘোড়াগুলি সুশ্রী সুপুষ্ট। এই ছুটির পরবে মত্ততা কিছুই দেখলুম না, চারি দিকে শান্ত আরামের ছবি এখানকার অরণ্য পর্বত ঝর্নার সঙ্গে মিশে গেছে।

গবর্নর কাল শহরের বাইরে বনের মধ্যে বিকেলে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঁ ধারে পাহাড়, ডাইনে ঘন অরণ্যের অন্ধকার ছায়ায় ঝর্না ঝরে পড়ছে। পাহাড়ী পথ বেয়ে বহু চেষ্টায় মোটর গেল। সেই বহুযুগের মেষপালকদের ভেড়া-চরা বনের মধ্যে চা খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলুম, হামাদানের যে মূর্তি চিরন্তন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে বুলবুল গান করে আসছে, আলেকজাণ্ডারের লুঠের বোঝার সঙ্গে সে অন্তর্ধান করে নি, কিন্তু পথের ধারে প্রান্তরের মধ্যে অনাদরে পড়ে আছে একটি পাথরের পিণ্ড, সম্রাটের সিংহদ্বারের সিংহের এই অপ-ভ্রংশ।

স্নানাহার সেরে দুপুরের পর হামাদান থেকে রওনা হলুম। যেতে হবে কির্মানশা। তখন ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়েছে, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। চলেছি আসাদা-বাদ গিরিপথ দিয়ে। দুই ধারে সবুজ খেত ফসলে ভরা, মাঝে মাঝে বনভূমি জলস্রোতে লালিত। মাঠে ভেড়া চরছে। পাহাড়গুলো কাছে এগিয়ে এসে তাদের শিলাবক্ষপট প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে এক-এক পসলা বৃষ্টি নেমে ধুলোকে দেয় পরাভূত করে। আমার কেবল মনে পড়ছিল 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃশ্যামাঃ'… তমালদ্রুমে নয়, কী গাছ ঠিক জানি নে, কিন্তু এই মেঘলা দিনে উপস্থিতমত ওকে তমালগাছ বলতে দোষ নেই।

আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি এরই কাছাকাছি কোনো-এক জায়গায় বিখ্যাত

নিহাবন্দের রণক্ষেত্রে সাসানীয় সাম্রাজ্য আরবদের হাতে লীলা সমাপন করে। সেইদিন বহুকালীন প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে হঠাৎ সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় শুরু হল।

অবশেষে আমাদের রাস্তা এসে পড়ল বেহিস্তনে। এখানে শৈলগাত্রে দরিয়ুসের কীর্তিলিপি পারসিক সুসীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় ক্ষোদিত। এই ক্ষোদিত ভাষার উর্ধ্বে দরিয়ুসের মূর্তি। এই মূর্তির সামনে বন্দীবেশে দশজন বিদ্রোহীর প্রতিরূপ। এরা তাঁর সিংহাসন-অধিরোহণে বাধা দিয়েছিল। দরিয়ুসের পূর্ববর্তী রাজা ক্যাম্বাইসিস (পারসিক উচ্চারণ কাম্ব্যোজিয়) ঈর্ষাবশত গোপনে তাঁর ভ্রাতা স্মর্দিস্‌কে হত্যা করিয়েছিলেন। যখন তিনি ঈজিপ্ট-অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে বলে এক ব্যক্তি নিজেকে স্মর্দিস্ নামে প্রচার করে সিংহাসন দখল করে বসে। ক্যাম্বাইসিস ঈজিপ্ট থেকে ফেরবার পথে মারা যান। তখন আকেমেনীয় বংশের অপরশাখাভুক্ত দরিয়ুস ছদ্মরাজাকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। প্রতিমূর্তিতে ভূমিশায়ী সেই মূর্তির বুকে দরিয়ুসের পা, বন্দী উর্ধ্বে দুই হাত তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। দরিয়ুসের মাথার উপরে অহুরমজ্‌দার মূর্তি।

অধ্যাপক হর্টজ্‌ফেল্‌ড্‌ বলেন, সম্প্রতি একটি শিলালিপি বেরিয়েছে তাতে দরিয়ুস জানাচ্ছেন, তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই বর্তমান। এই প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার কী করে সম্ভব হল তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে এক-একটা দ্বীপ দেখা যায় যা ভূমিকম্পের হাতে তৈরি। তার সর্বত্র গলিত ধাতু আর অগ্নিস্রাবের চিহ্ন। তেমনি বহুযুগ ধরে ইতিহাসের ভূমিকম্পে এবং অগ্নি-উদ্গীরণে পারস্যের জন্ম। প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস স্থাপন করেন, তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ, পারস্যের চারি দিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজশক্তির স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন করে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ-না-কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানা জাতির সঙ্গে এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ, ঐতিহাসিক সত্তা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, মহাজাতির ইতিহাস সৃষ্টি করে নি। আর্যের সঙ্গে অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রধানত সামাজিক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য বহুসংখ্যক অনার্যের মাঝখানে পড়ে নিজের সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ রাষ্ট্রজয়ের নয়, সমাজরক্ষার— সীতা সেই সমাজনীতির প্রতীক। রাবণ সীতাহরণ করেছিল, রাজ্যহরণ করে নি। মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব, এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাদের

পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেছে অপমান। শাহ্‌নামায় আছে প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনী, ইরানীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ। তাতে ভগবদ্‌গীতার মতো তত্ত্বকথা বা শান্তিপর্বের মতো নীতি-উপদেশ প্রাধান্য পায় নি।

পারস্য বারবার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে। গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্যে অনার্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত্তি পাততে পারে নি। দরিয়ুস শিলাবক্ষে এমনভাবে আপন জয়ঘোষণা করেছেন যাতে চিরকাল তা স্থায়ী হয়। কিন্তু এই জয়ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক, দরিয়ুস পারসিক রাষ্ট্রসত্তার জন্যে বৃহৎ আসন রচনা করেছিলেন ; যেমন সাইরাসকে তেমনি দরিয়ুসকে অবলম্বন করে পারস্য আপন অখণ্ড মহিমা বিরাট ভূমিকায় অনুভব করতে পেরেছিল। পারস্যে পর্বে পর্বে এই রাষ্ট্রিক উপলব্ধি পরাভবকে অতিক্রম করে জেগেছে, আজও আবার তার জাগরণ হল। এখানকার প্রধানমন্ত্রী আমাকে যা বলেছিলেন তার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, আপন সমাজনিহিত দুর্বলতার কারণ দূর করাই ভারতবর্ষের সমস্যা, আর পারস্যের সমস্যা আপন শাসনব্যবস্থার অপূর্ণতা মোচন করা। পারস্য সেই কাজে লেগেছে, ভারতবর্ষ এখনো আপনার যথার্থ কাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লাগে নি।

বেহিস্তুন থেকে বেরলুম। অদূরে তাকিবুস্তানের পাহাড়ে উৎকীর্ণ মূর্তি। শহর থেকে মাইল-চারেক দূরে। গবর্নরের দূত এসে পথের মধ্যে থেকে সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। দূরে থেকেই দেখা যায় অগভীর গুহাগাত্রে খোদাই-করা মূর্তি, তার সামনে কৃত্রিম সরোবরে ঝরে পড়ছে জলস্রোত। দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় দলিত একজন বন্দী। কোনো লেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু সাজসজ্জায় বোঝা যায় এরা সাসানীয়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করে তোলা একটি গম্বুজাকৃতি কক্ষের উর্ধ্বভাগে বাম হাতে অভিষেকের পাত্র ও ডান হাতে মালা নিয়ে পাখা মেলে বিজয়দেবতা দাঁড়িয়ে, তার নীচে এক দাঁড়ানো মূর্তি এবং তার নীচে বর্মপরা অশ্বারোহী। পাশের দেয়ালে শিকারের ছবি। এই মূর্তিগুলিতে আশ্চর্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।

সাসানীয় যুগ বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে বলে রাখি।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে আকেমেনীয় রাজত্বের অবসান হল। পরে যে জাত

পারস্যকে দখল করে তাদের বলে পার্থীয়। তারা সম্ভবত শকজাতীয়; প্রথমে গ্রীকদের প্রভাবে আসে, পরে তারা পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৬ খ্রীস্টাব্দে সাসানের পৌত্র আর্দাশির পার্থীয় রাজার হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নিয়ে আর-একবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের সময়কার প্রবল সম্রাট ছিলেন শাপুর, তিনিই রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

আকেমেনীয়দের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রীয়, সাসানীয়দের আমলে আর-একবার প্রবল উৎসাহে এই ধর্মকে জাগিয়ে তোলা হয়।

ঋজু প্রশস্ত নূতন-তৈরি পথ বেয়ে আসছি। অদূরে সামনে পাহাড়ের গায়ে কির্মানশা শহর দেখা দিল। পথের দুই ধারে ফসলের খেত, আফিমের খেত ফুলে আচ্ছন্ন, মেঘের আড়াল থেকে অস্তসূর্যরশ্মির আভা পড়ে সদ্যধৌত গাছের পাতা ঝলমল করছে।

শহরে প্রবেশ করলুম। পরিষ্কার রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ পণ্যের দোকান। পথের ধুলো মারবার জন্যে ভিস্তিরা মশকে করে জল ছিটচ্ছে। সুন্দর বাগানের মধ্যে আমাদের বাসা। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার গবর্নর। ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। এই পরিষ্কার সুসজ্জিত নূতন বাড়িটি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়ে গৃহস্বামী চলে গেছেন।

১০

কির্মানশা থেকে যাত্রা করে বেরলুম। আজ যেতে হবে কাস্‌রিশিরিনে, পারস্যের সীমানার কাছে। তার পরে আসবে কানিকিন, আরব-সীমানার রেলওয়ে স্টেশন।

পারস্যে প্রবেশপথে আমরা তার যে নীরস মূর্তি দেখেছিলুম এখন আর তা নেই। পাহাড়ের রাস্তার দুই ধারে খেত ভরে উঠেছে ফসলে, গ্রামও অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন, চাষীরা চাষ করছে এ দৃশ্যও চোখে পড়ল, তা ছাড়া এই প্রথম গোরু চরতে দেখলুম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে সাহাবাদে পৌঁছলুম। এখানে রাজার একটি প্রাসাদ নতুন তৈরি হয়েছে, গবর্নর সেখানে গাছের ছায়ায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সঙ্গে চললেন, কেরুন্দ-নামক জায়গায় মধ্যাহ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। বড়ো সুন্দর এই গ্রামের চেহারাটি। তরুচ্ছায়ানিবিড় পাহাড়ের কোলে আশ্রিত লোকালয়, ঝর্না ঝরে পড়ছে এদিক-ওদিক দিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে। গ্রামের দোকানগুলির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পথ, কৌতূহলী জনতা জমেছে।

তার পরের থেকে ধরণীর ক্রমেই সেই আবার শুষ্কনৈরাশ্যের মূর্তি। আমরা পারস্যের উচ্চভূমি থেকে নেমে চলেছি। সকলেই ভয় দেখিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গরম পাব। তার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। হাওয়াটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো। পারস্যের শেষ সীমানায় যখন পৌঁছলুম দেখা গেল বোগদাদ থেকে অনেকে এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কেউ কেউ রাজকর্মচারী, কেউ-বা খবরের কাগজের সম্পাদক, অনেকে আছেন সাহিত্যিক, তা ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়। এঁরা কেউ কেউ ইংরেজি জানেন। একজন আছেন যিনি ন্যূয়র্কে আমার বক্তৃতা শুনেছেন। সেখানে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ করে ইনি এখানকার শিক্ষা-বিভাগের কাজে নিযুক্ত। স্টেশনের ভোজনশালায় চা খেতে বসলুম। একজন বললেন, যাঁরা এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন। 'আমরা সকলেই এক। ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করছে আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নে।' ভারতীয়েরাও বলেন, 'এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র অভাব নেই।' দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে তুরুস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায় মুসলমানের সীমানায়। এ কি পরাধীনতার মরুদৈন্যে লালিত ঈর্ষাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্যচিত্তজাত বুদ্ধিহীনতা।

অভ্যর্থনাদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কবি ছিলেন, আমার চেয়ে দুই-এক বছরের ছোটো। পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, শান্ত স্তব্ধ মানুষটি। তাঁর মুখচ্ছবি ভাবুকতায় আবিষ্ট। ইরাকের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে বড়ো কবি বলে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

অনেক দিন পরে মোটর ছেড়ে রেলগাড়িতে চড়া গেল। গাড়িগুলি আরামের। দেহটা এতকাল পথে পথে কেবলই ঠোকর খেয়ে নাড়া খেয়ে একদণ্ড নিজেকে ভুলে থাকতে পারছিল না, আজ বাহনের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

জানালার বাইরে এখনো মাঝে মাঝে ফসলের আভাস দেখা যায়, বোধ হয় যেন কোথাও কোথাও খাল-নালা দিয়ে জলসেকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপরে কঠিন এখানকার ধূসরবর্ণ মাটি।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো স্টেশনে অভ্যর্থনার জনতা পেরিয়ে এলুম। যখন শোনা গেল বোগদাদ আর পনেরো মিনিট পথ দূরে তখনো তার পূর্বসূচনা কিছুই নেই, তখনো শূন্য মাঠ ধূ ধূ করছে।

অবশেষে বোগদাদে এসে গাড়ি থামল। স্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। নানাশ্রেণীর

প্রতিনিধি এসে আমাকে সম্মান জানিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা দিলেন মালা পরিয়ে। ছোটো ছোটো দুটি মেয়ে দিয়ে গেল ফুলের তোড়া। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে একটি বাঙালি মেয়েকেও দেখলেম। বোগদাদের রাস্তা কতকটা আমাদেরই দেশের দোকান-বাজার-ওয়ালা পথের মতো। একটা বিশেষত্ব আছে, মাঝে মাঝে পথের ধারে কাঠের বেঞ্চি-পাতা চা খাবার এবং মেলামেশা করবার জায়গা। ছোটোখাটো ক্লাবের মতো। সেখানে আসর জমেছে। এক-এক শ্রেণীর লোক এক-একটি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে আলাপের প্রসঙ্গে ব্যাবসার জেরও চলে। শহরের মতো জায়গায় এরকম সামাজিকতাচর্চার কেন্দ্র থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে গল্প বলবার কথক ছিল, তখন তারা এই-সকল পথপ্রান্তসভায় কথা শোনাত। আমাদের দেশে যেমন কথকের ব্যাবসা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এদের এখানেও তাই। এই বিদ্যাটি ছাপার বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলে না। মানুষ আপন রচিত যন্ত্রগুলোর কাছে আপন সহজ শক্তিকে বিকিয়ে দিচ্ছে।

টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। আমার ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত, ওপারে ঘন গাছের সার, খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডান দিকে নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য-পারাপারের জন্য গত যুদ্ধের সময় জেনারেল মড অস্থায়ীভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

চেষ্টা করছি বিশ্রাম করতে, কিন্তু সম্ভাবনা অল্প। নানারকম অনুষ্ঠানের ফর্দ লম্বা হয়ে উঠছে। সকালে গিয়েছিলুম ম্যুজিয়ম দেখতে; নূতন স্থাপিত হয়েছে, বেশি বড়ো নয়, একজন জর্মান অধ্যাপক এর অধ্যক্ষ। অতি প্রাচীন যুগের যে-সব সামগ্রী মাটির নীচে থেকে বেরিয়েছে সেগুলি দেখালেন। এ-সমস্ত পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেকার পরিশিষ্ট। মেয়েদের গহনা, ব্যবহারের পাত্র প্রভৃতি সুদক্ষ হাতে রচিত ও অলংকৃত। অধ্যাপক বলেন, এই জাতের কারুকার্যে স্থূলতা নেই, সমস্ত সুকুমার ও সুনিপুণ। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অভ্যাস না হলে এমন শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হত না। এদের কাহিনী নেই জানা, কেবল চিহ্ন আছে। এটুকু বোঝা যায় এরা বর্বর ছিল না। পৃথিবীর দিনরাত্রির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট এই-সব নরনারীর সুখদুঃখের পর্যায় আমাদেরই মতো বয়ে চলত। ধর্মে কর্মে লোকব্যবহারে এদেরও জীবনযাত্রার আর্থিক-পারমার্থিক সমস্যা ছিল বহুবিচিত্র। অবশেষে, কী আকারে ঠিক জানি নে, কোন্ চরম সমস্যা বিরাটমূর্তি নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়াল, এদের জ্ঞানী কর্মী ভাবুক, এদের পুরোহিত, এদের সৈনিক, এদের রাজা, তার কোনো সমাধান করতে

পারলে না, অবশেষে ধরণীর হাতে প্রাণযাত্রার সম্বল কিছু কিছু ফেলে রেখে দিয়ে সবাইকে চলে যেতে হল। কোথায় গেল এদের ভাষা, কোথায় এদের সব কবি, এদের প্রতিদিনের বেদনা কোনো ছন্দের মধ্যে কোথাও কি সংগ্রহ করা রইল না। কেবল-মাত্র আর আট-দশ হাজার বছরের প্রান্তে ভাবীকালে দাঁড়িয়ে মানুষের আজকের দিনের বাণীর প্রতি যদি কান পাতি, কোনো ধ্বনি কি পৌঁছবে কানে এসে, যদি-বা পৌঁছয় তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারব।

আজ অপরাহ্ণে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। বাগানের গাছের ছায়ায় আমাদের আসন। ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের আয়োজন জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত। একে একে নানা লোকে তাঁদের অভিনন্দন পাঠ শেষ করলে সেই বৃদ্ধ কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন। বজ্রমন্দ্র তাঁর ছন্দপ্রবাহ, আর উদ্দাম তাঁর ভঙ্গি। আমি তাঁদের বললেম, এমন কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; এ যেন উত্তাল তরঙ্গিত সমুদ্রের বাণী, এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদ্গাথা।

অবশেষে আমার পালা উপস্থিত হতে আমি বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে, ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আরবসাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর-একবার ভারতবর্ষে পাঠান— যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে— আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনামী রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।

রাজা আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন নদীর ওপারে তাঁর একটি বাগানবাড়িতে। রাজা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য মানুষ, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার। খোলা চাতালে আমরা বসলুম, সামনে নীচে বাগান। রাজার ভাইও আছেন তাঁর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আছেন— অল্প বয়স, এখানকার সবাই বলেন, আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্রী ইনি। যিনি দোভাষীর কাজ করবেন তিনিও উপস্থিত। রাজা বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব বেধেছে নিশ্চয়ই সেটা ক্ষণিক। যখন কোনো

দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্‌বোধন আসে তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে। আমি বললেম, আজ তুর্কি ইজিপ্ট পারস্যে নবজাগ্রত জাতির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখলুম, যে বিশিষ্টতাবোধ সংকীর্ণভাবে আত্মনিহিত ও অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ, সচেষ্টতার সঙ্গেই তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, নইলে সেই অন্ধতার দ্বারা জাতির রাষ্ট্রবুদ্ধি অভিভূত হয়। ভারতবর্ষের উদ্‌বোধনে যদি সেই সর্বজনের হিতজনক শুভবুদ্ধির আবির্ভাব দেখতে পেতেম তা হলে নিশ্চিন্ত হতেম। কিন্তু যখন দেখতে পাই হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী ধর্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে রাষ্ট্রসংঘকে প্রতিহত করছে তখন হতাশ হতে হয়।

এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জর্মানি ও তুরুস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে-পরাজয়ে নিত্যসংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম। তখনকার মৃত্যুচ্ছায়াক্রান্ত দিনরাত্রির সেই বিভীষিকার মধ্যে তাঁর উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনো-একটা স্থান পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ বসেছি চায়ের টেবিলে এই নূতন ইতিহাসসৃষ্টিকর্তার পাশে সহজভাবে; কেননা আমিও অন্য উপকরণ নিয়ে মানুষের ইতিহাসসৃষ্টিতে আপন শক্তি উৎসর্গ করেছি। সেই স্বতন্ত্র অথচ যথার্থ সহযোগিতার মূল্য যদি না এই বীর বুঝতে পারতেন তবে তাঁর যুদ্ধবিজয়ী শৌর্য আপন মূল্য অনেকখানি হারাত। কর্নেল লরেন্স বলেছেন, আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নীচেই রাজা ফয়সলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্তি দেখেছি তাঁর সহজ আতিথ্যে, এবং তাঁকে অভিবাদন করেছি। বর্তমান এশিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল দেখা গেল— উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।

১১

এখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেম এখানকার ছাত্রীদের নিমন্ত্রণসভায়। সংকীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলি। পুরাতন বাড়ি দুই ধারে সার বেঁধে উঠেছে, কিন্তু তার ভিতরকার লোকযাত্রা বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণগৃহের প্রাঙ্গণে সব মেয়েরা বসেছে। এক ধারে কয়েকটি মেয়ে আলাদা স্থান নিয়েছেন, তাঁরা কালো কাপড়ে সম্বৃত, কিন্তু মুখ ঢাকা নয়। বাকি সবাই বিলাতি পোশাক পরা, স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকবার চেষ্টামাত্র নেই, হাসিগল্পে সভা মুখরিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখপ্রান্ত আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। তারই রোয়াকে আমার চৌকি পড়েছে। অনুরোধে পড়ে কিছু আমাকে বলতে হল; বলা হলেই কয়েকজন মেয়ে এসে আমাকে ফরমাশ করলেন আমার কাব্য আবৃত্তি করতে। আগের দিনে এঁরা আবৃত্তি শুনেছিলেন। নিজের লেখা কিছু তো মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা করে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' কবিতার প্রথম শ্লোক পড়ে গেলেম, একটা জায়গায় ঠেকে যেতেই অর্থহীন শব্দ দিয়ে ছন্দ পূরণ করে দিলুম।

তার পর সন্ধ্যাবেলায় ভোজনের নিমন্ত্রণ। শিক্ষাবিভাগের লোকেরা আয়োজন করেছেন। নদীর ধারের দিকে প্রকাণ্ড একটা ছাদ, সেখানে আলোকমালার নীচে বসে গেছেন অনেক লোক। আমাদের সেই বৃদ্ধ কবিও আমার কাছেই ছিলেন। আহারের পর আমার অভিনন্দন সারা হলে আমাকে কিছু বলতে হল, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কী মত এঁরা শুনতে চেয়েছিলেন।

শ্রান্তি ঘনীভূত হয়ে আসছে। আমার পক্ষে নড়েচড়ে দেখে শুনে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে এল। কথা ছিল সকালে টেসিফোনের (Ctesiphon) ভগ্নাবশেষ দেখতে যেতে হবে। আমি ছাড়া আমার দলের বাকি সবাই দেখতে গেলেন। একদা এই শহরের গৌরব ছিল অসামান্য। পার্থিয়ানেরা এর পত্তন করে। পারস্যে অনেকদিন পর্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। রোমকেরা বারবার এদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি পার্থীয়েরা খাঁটি পারসিক ছিল না। তারা তুর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়, শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে। ২২৮ খ্রীস্টাব্দে আর্দাশির পার্থীয়দের জয় করে আবার পারস্যকে পারসিক শাসন ও ধর্মের অধীনে এক করে তোলেন। ইনিই সাসানীয় বংশের প্রথম রাজা। তার পরে বারবার রোমানদের উপদ্রব এবং সবশেষে আরবদের আক্রমণ এই শহরকে অভিভূত করেছিল। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলে আরবেরা এখান থেকে সমস্ত মালমসলা সরিয়ে বোগদাদে রাজধানী

স্থাপন করে— টেসিফোন ধুলোয় গেল মিলিয়ে, বাকি রইল বৃহৎ প্রাসাদের একটুখানি খিলান। এই প্রাসাদ প্রথম খসরুর আদেশে নির্মিত হয় সাসানীয় যুগের মহাকায় স্থাপত্যশিল্পের একটি অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্তরূপে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ। ঐশ্বর্যগৌরব প্রমাণ করবার জন্যে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই। রাজার এই অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যে আমার চিত্তকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে। পারিষদবর্গ যাঁরা একত্রে আহার করছিলেন হাস্যালাপে তাঁদের সকলের সঙ্গে এঁর অতি সহজ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও বিশেষ ভোজে আহারের পরিমাণে ও আয়োজনে নির্বোধের মতো যে অতিবাহুল্য করে থাকে রাজার ভোজে তা দেখলুম না। লম্বা টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা। বিরলভাবে কয়েকটি ফুলের তোড়া আছে, তা ছাড়া সাজসজ্জার চমক নেই একটুও। এতে আতিথ্যের যথার্থ আরাম পাওয়া যায়।

বউমা রানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন— ভদ্রঘরের গৃহিণীর মতো আড়ম্বরহীন সরল অমায়িক ব্যবহার, নিজেকে রানী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াসমাত্র নেই।

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা করে না যাওয়াই ভালো। তার পরে মনে পড়ল, একদা আস্ফালন করে লিখেছিলুম, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।' তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ করে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম। পথের মধ্যে হঠাৎ নিয়ে গেল ট্রেনিং স্কুলের ছেলেদের মাঝখানে, হঠাৎ তাদের কিছু বলতেও হল। পথে পথে কত কথাই ছড়াতে হয়, সে পাকা ফল নয়, সে ঝরা পাতা, কেবলমাত্র ধুলোর দাবি মেটাবার জন্যে।

তার পরে গাড়ি চলল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। বালুমরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেছে নালা কেটে, তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েছে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্তা আর-এক মোটরে করে চলেছেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ণ চক্ষু; বেদুয়িনী পোশাক।

অর্থাৎ, মাথায় একখণ্ড সাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মতো বস্ত্রবেষ্টনী। ভিতরে সাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাতলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা

বললেন, যদিও ইনি পড়াশুনো করেন নি বললেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তিনি এখানকার পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধূ ধূ করছে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষপালক নিয়ে চলেছে ভেড়ার পাল, কোথাও চরছে উট, কোথাও-বা ঘোড়া। হু হু করে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঘুর খেতে খেতে ছুটেছে ধূলির আবর্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে, কফি সিদ্ধ হচ্ছে, খাচ্ছে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, এক প্রান্তে তক্তপোশের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির 'পরে মাটির ছাদ। আত্মীয়বান্ধবেরা সব এদিকে-ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তেতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার ইচ্ছা করি কি না, 'না' বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে শুরু হল একটু সংগীতের ভূমিকা। গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া-জড়ানো একটা তেড়াবাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেহুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিম্‌চি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু-তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। পূর্ববর্তী মিহি-করুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে, অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চলবে না। তাই অদূরে আর-একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁরা স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথিদের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তাবশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হল নাচের ফরমাশ। একজন একঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে

চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে আগে নাচতে লাগল, তারই কিঞ্চিৎ ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছিল। ইতিমধ্যে বউমা গেলেন এদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েরা তাঁকে নাচ দেখালেন, তিনি বলেন সে নাচের মতো নাচ বটে— বোঝা গেল য়ুরোপীয় নটীরা প্রাচ্য নাচের কায়দায় এদের অনুকরণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ রস দিতে পারে না।

তার পরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখলুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে, চিৎকার করতে করতে, চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে, তাদের মাতুনি— ও দিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্ছে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠলুম, সঙ্গে চললেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা।

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না, কেননা পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয় নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি কর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে; জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্বলেরা বাদ পড়ে যারা নিতান্ত টিঁকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক-একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো; নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে শৌখিন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবি এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম, সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন-দলপতি যখন বললেন 'আমাদের আদিগুরু বলেছেন যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ মুসলমান', তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো-কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র-ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন; তিনি বললেন, আমি তাঁদের সত্যতায় বিশ্বাস করি নে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেম, অন্তত

আরবদেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পান নি। আমি এঁকে বললেম, একদিন কবিতায় লিখেছি 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'— আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন-হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।

তার পরে যখন আমাদের মোটর চলল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হল মরুভূমির ঘূর্ণা-হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে।

বোধ হচ্ছে আমার ভ্রমণ এই 'আরব বেদুয়িনে' এসেই শেষ হল। দেশে যাত্রা করবার আর দু-তিন দিন বাকি, কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে এর মধ্যে আর-কোনো দেখাশোনা চলবে না। তাই এই মরুভূমির বন্ধুত্বের মধ্যে ভ্রমণের উপসংহারটা ভালোই লাগছে। আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে, বেদুয়িন-আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু বেদুয়িন-দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না। তিনি হেসে বললেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্যে মহাজনরা যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের 'পরে চড়িয়ে তাদের কর্তা সাজিয়ে আনে। আমি তাঁকে বললুম, চীনে ভ্রমণ করবার সময় আমার কোনো চৈনিক বন্ধুকে বলেছিলেম, 'একবার চীনের ডাকাতের হাতে ধরা পড়ে আমার চীনভ্রমণের বিবরণটাকে জমিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে।' তিনি বললেন, 'চীনের ডাকাতেরা আপনার মতো বৃদ্ধ কবির 'পরে অত্যাচার করবে না, তারা প্রাচীনকে ভক্তি করে।' সত্তর বছর বয়সে যৌবনের পরীক্ষা চলবে না। নানা স্থানে ঘোরা শেষ হল, বিদেশীর কাছ থেকে কিছু ভক্তি নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়েই দেশে ফিরে যাব, তার পরে আশা করি কর্মের অবসানে শান্তির অবকাশ আসবে। যুবকে যুবকে দ্বন্দ্ব ঘটে, সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে সংসারপ্রবাহের বিকৃতি দূর হয়। দস্যু যখন বৃদ্ধকে ভক্তি করে তখন সে তাকে আপন জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যুবকের সঙ্গেই তার শক্তির পরীক্ষা, সেই দ্বন্দ্বের আঘাতে শক্তি প্রবল থাকে, অতএব ভক্তির সুদূর অন্তরালে পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।

প্রান্তিক

'প্রান্তিক' ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রায় সব কয়টি কবিতাই ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর মাসের সংকটাপন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে রচিত হয়। ১৪, ১৫ এবং ১৬-সংখ্যক কবিতা কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা।

১৪-সংখ্যক কবিতাটি 'চাঁদপুর য়ুনিয়ন ইন্‌স্টিট্যুটে ত্রিসপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিগুরুর আশীর্বাদবাণী' রূপে প্রেরিত হয়।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি বিচিত্রার ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যায় 'শরৎ' নামে মুদ্রিত হয়। শেষসপ্তকের ২৩-সংখ্যক কবিতা ইহার গদ্য পাঠান্তর বলা যাইতে পারে।

১৬-সংখ্যক কবিতাটি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের ৩৪-সংখ্যক কবিতার সহিত তুলনীয়।

১৭-সংখ্যক কবিতার দুইটি পূর্বপাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপমহিমায় হলে মহীয়ান সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ. ২৫০

জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
রূপসত্তায় এলে যবে সাজি, সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।

দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।
সম্মুখে তব গেছে দূর-পানে জীবযাত্রার পন্থ,
তুমি সেথা চল— বলো কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

২২।৩।৩৪

—জয়শ্রী। বৈশাখ ১৩৪১

১৮-সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত 'বর্ষামঙ্গল' পাণ্ডুলিপির নিম্নসংকলিত উপসংহারের অংশ তুলনীয়—

নটরাজ। পালার শেষে শান্তিবাচনিকের নিয়ম আছে। আজ বিষধর নাগিনীরা জগতের চার দিকে ফণা তুলে গর্জন করছে। আজ শান্তির কথা পরিহাসের মতো শোনাবে। তাই উপসংহারে ডাক দিয়ে যাই তাদের, অকল্যাণের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে যারা প্রস্তুত।

[?১৯৩৭]

সেঁজুতি

'সেঁজুতি' ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনা-তারিখ সংশোধিত ও সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভের 'জন্মদিন' কবিতাটি ১৩৪৫ সালের ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যায় কালিম্পঙে গৌরীপুরভবন হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মবাসর উপলক্ষে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন।

'পত্রোত্তর' কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত 'কবি নারদ' (প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৪৫) কবিতার উত্তরে লিখিত।

'পলায়নী' কবিতাটির প্রথম দুইটি স্তবক ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে অনুরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম স্তবকের শেষাংশ ও দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভাংশ 'সেঁজুতি'র পাঠে বর্জিত হইয়াছে। সেই বর্জিত অংশ নিম্নে প্রবাসী হইতে উদ্‌ধৃত হইল—

পলায়নভীরু পুরী দিনরাত
তোমার সমুখে জোড় করে হাত,
বাঁধা ঘাটে ঘাটে রচে প্রণিপাত,
মাথা হেঁট করে তীরে॥

মাটির কণ্ঠে যেখানে অভয়
মিথ্যা ভাষায় রটে,
সেথা ভিড় করে যত লোকালয়
ভাঙন-লুকানো তটে।
মুখরিত হয় স্থিতিভিক্ষার
বন্দনাধ্বনি সেথা বার বার,
কল্পিত করে প্রার্থনা তার
শিল্পিত মন্দিরে।

প্রবাসীতে উক্ত কবিতার চতুর্থ স্তবকের পর ('সেঁজুতি'র পাঠে তৃতীয় স্তবকের পর) নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ নূতন স্তবক পাওয়া যায়—

উধাও বাতাসে মেঘ ভেসে আসে
বহিয়া রঙিন ছায়া।
তোমারি ছন্দে রচিছে আকাশে
ক্ষণিকের চিরমায়া।
বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে
সবুজ পাতার বন্যার নীরে
কভু ঝড়ে কভু শান্ত সমীরে
তোমারি ছন্দ যাচে।
তোমারি ছন্দে পাখির ওড়া সে,
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে,
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে
নিত্য নাচনে নাচে।

'তীর্থযাত্রিণী' কবিতাটির উপসংহারে প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪) এই দুইটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত হইয়াছিল—

সংসারে মরীচিকারে বিশ্বাস করিয়াছিল ও যে,
সংসার বাহির-তীরে পুন ফিরে তারি ব্যর্থ খোঁজে।

'জন্মদিন' কবিতাটির চতুর্থ স্তবকের পরে প্রবাসীতে (আষাঢ় ১৩৪৪) এই বর্জিত স্তবকটি পাওয়া যায়—

আজ কেন ওর মনে লাগে, এবার যাত্রাশেষে
নৌকো আবার পাড়ি দিল আরেক ছুটির দেশে।

এ ঘাট থেকে বোঝাই ক'রে চলেছে স্রোত বাহি
সেই পসরা হিসাব যাহার নাহি,
আপনাতে যা আপনি অফুরান,
ভাঙা বাঁশির মৌন-পারে জমেছে যার গান।

নবীন

'নবীন' ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রচিত হয়। ওই সালের চৈত্র মাসে কলিকাতায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উহা মঞ্চস্থ হইবার উপলক্ষে ওই নামের গীতিনাটিকাটি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'বনবাণী' গ্রন্থে (আশ্বিন ১৩৩৮) পরিবর্তিত আকারে 'নবীন' পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত, অন্যত্র-ব্যবহৃত পুরাতন গানগুলি ও তৎপ্রাসঙ্গিক কথাবস্তু এই সংস্করণে বর্জিত হয়। বর্তমান খণ্ডে 'বনবাণী'র অন্তর্গত সেই শেষ পাঠই মুদ্রিত হইল। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রথম পাঠও পরিশিষ্টে মুদ্রিত রহিল।

শাপমোচন

'শাপমোচন' ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের [১৯৩১] ১৫ পৌষ তারিখে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী-ছাত্রছাত্রী-উৎসবপরিষৎ'-কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৫ ও ১৬ পৌষ রাত্রে কবির জোড়াসাঁকো-ভবনে নৃত্যগীত ও পাঠ-সহযোগে ইহা প্রথম-অভিনীত হইয়াছিল।

উক্ত পুস্তিকার কথিকা অংশ ১৩৩৮ সালের মাঘ-সংখ্যা বিচিত্রায় মুদ্রিত হয়, এবং ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে স্বতন্ত্র কবিতা আকারে উহা 'পুনশ্চ' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড)। পরে ১৩৩৯ সালে ১৫ ও ১৬ চৈত্র রাত্রে [২৯, ৩০ মার্চ ১৯৩৩] এম্পায়ার থিয়েটারে পুনরভিনয়কালে শাপমোচনের একটি পরিমার্জিত নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়। তাহাতে গানেরও অনেক অদল-বদল করা হয়। বর্তমান খণ্ডে 'শাপমোচন' সেই পরিমার্জিত নাট্য-আকারে মুদ্রিত হইল।

১৩৩৮ সালের প্রথম নৃত্যাভিনয়ে ব্যবহৃত গানগুলির প্রথম পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত পুস্তিকার ক্রম-অনুসারে নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

১। পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়
২। ভরা থাক্‌ স্মৃতিসুধায়

৩। তুমি কি কেবল ছবি
৪। তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
৫। বাজো রে বাঁশরি, বাজো
৬। লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি
৭। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
৮। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
৯। আন্‌মনা গো আন্‌মনা
১০। আমি এলেম তারি দ্বারে
১১। চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো
১২। বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা
১৩। এসো আমার ঘরে
১৪। বাহিরে ভুল হানবে যখন
১৫। পাখি আমার নীড়ের পাখি
১৬। না যেয়ো না যেয়ো নাকো
১৭। সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
১৮। অরূপবীণা রূপের আড়ালে
১৯। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি

'পরবাসী চলে এসো ঘরে' ও 'দে পড়ে দে আমায় তোরা' এই দুইটি গান পুস্তিকায় মুদ্রিত না থাকিলেও অভিনয়ে সংযোজিত হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে 'শাপমোচন' মাদ্রাজে মঞ্চস্থ হইবার অনতি-পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন গান বিশেষভাবে এই নাটিকাটির জন্যই রচনা করেন। গানগুলি বর্তমান খণ্ডে শাপমোচনের সংযোজন-অংশে মুদ্রিত হইল। উহার মধ্যে দুই-একটি গান শেষ পর্যন্ত উক্ত অভিনয়ে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। মাদ্রাজের এই অভিনয়প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখের এক পত্রে প্রতিমা দেবীকে লেখেন—

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিসটা [শাপমোচন] এবার সবসুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েছে।

—পত্র ৪৪, চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড

'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে' ও 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী' গান দুইটি বাদে

শাপমোচনের এই নূতন গানগুলি ও উহাদের স্বরলিপি ১৩৪১-৪২ সালের প্রবাসী ও বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে [১৯৪০] শান্তিনিকেতনে শাপমোচনের যে অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নাটিকাটির উহাই শেষ অভিনয়। উক্ত অভিনয়ে ব্যবহারের জন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজে যে গানগুলি নির্বাচন করিয়া দেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্তে নিম্নে তাহার তালিকা মুদ্রিত হইল—

প্রথম দৃশ্য। ইন্দ্রসভা

১। নহ মাতা, নহ কন্যা
২। হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র
৩। ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরুণেশ্বরের প্রাসাদ

১। তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে
২। ওরে চিত্ররেখাডোরে
৩। তুমি কি কেবল ছবি
৪। কখন দিলে পরায়ে

তৃতীয় দৃশ্য। মদ্ররাজগৃহে কমলিকা

১। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
২। তোমায় সাজাব যতনে
৩। দে পড়ে দে আমায় তোরা
৪। বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে
৫। বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে
৬। তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
৭। বাজো রে বাঁশরি, বাজো
৮। লহো লহো তুলে লহো

চতুর্থ দৃশ্য। পতিগৃহে রাজবধূ

১। হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
২। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
৩। কাছে থেকে দূর রচিল
৪। আন্‌মনা আন্‌মনা

৫। হায় রে, ওরে যায় না কি জানা
৬। বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
৭। অসুন্দরের পরম বেদনায়
৮। একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে
৯। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে
১০। না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।

পঞ্চম দৃশ্য। নির্জন বনে রানী

১। সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
২। কোন্ গহন অরণ্যে তারে
৩। ও কি এল, ও কি এল না
৪। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি

উল্লিখিত চতুর্থ দৃশ্যের ৮ ও ৯ -সংখ্যক গানের পাঠ এই গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ হইতে ভিন্ন। তুলনার্থ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

রাজা। একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে।

রানী। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো ওই শোনো, উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক্-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

কালের যাত্রা

'কালের যাত্রা' বাংলা ১৩৩৯ সালের [১৯৩২] ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ২১৬-২২৫) 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া-পুনর্লিখিত রূপ। বর্তমান সংস্করণে 'কালের যাত্রা'র পরিশিষ্টরূপে 'রথযাত্রা' নাটিকাটি প্রবাসী হইতে মুদ্রিত হইল। স্বতন্ত্র গ্রন্থে বৈশাখ ১৩৭৮ সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

'কবির দীক্ষা'র পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় (পৃ. ২-৪) 'শিবের ভিক্ষা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে [ভাদ্র ১৩৩৯] লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' -নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই— রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৯, পৃ. ৪৯২

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলির অধিকাংশই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

সদর ও অন্দর	প্রদীপ	আষাঢ়	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	শ্রাবণ	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	ভারতী	ভাদ্র	১৩০৭
ফেল	ভারতী	আশ্বিন	১৩০৭
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	আশ্বিন	১৩০৭
নষ্টনীড়	ভারতী	বৈশাখ-অগ্রহায়ণ	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	ফাল্গুন	১৩০৯
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	চৈত্র	১৩০৯
কর্মফল	কুন্তলীন পুরস্কার বার্ষিকী		১৩১০
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	আষাঢ়-শ্রাবণ	১৩১৪

গুপ্তধন	বঙ্গভাষা	কার্তিক	১৩১৪
রাসমণির ছেলে	ভারতী	আশ্বিন	১৩১৮
পণরক্ষা	ভারতী	পৌষ	১৩১৮

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'প্রতিবেশিনী', এই তিনটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানিতে পারা যায় নাই ; এইজন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ-অনুসারে —গল্পগুচ্ছ, মজুমদার এজেন্সি। প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩০৭) 'প্রতিবেশিনী', দ্বিতীয় খণ্ডে [১৯০১] 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' ও 'উলুখড়ের বিপদ'— সেগুলি বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলি এইরূপে সর্বপ্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়: সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল —গল্পগুচ্ছ ১, মজুমদার এজেন্সি, ১ আশ্বিন ১৩০৭। শুভদৃষ্টি —গল্পগুচ্ছ ২, মজুমদার লাইব্রেরি [১৯০১]। নষ্টনীড় —হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১৩১১। দর্পহরণ, মাল্যদান, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা —গল্প চারিটি [১৯১২]। মাস্টারমশায়, গুপ্তধন —গল্পগুচ্ছ ৫, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩১৫।

'কর্মফল' ১৩১০ সালেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও মুদ্রিত হয়; এই গল্পটি কবি-কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়া 'শোধবোধ' নাটকরূপে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

পারস্যে

'জাপানে-পারস্যে' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার 'জাপানে' অংশে পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'জাপানযাত্রী' (১৩২৬) এবং 'পারস্যে' অংশে তৎকালীন নূতন রচনা পারস্যভ্রমণের বৃত্তান্ত একত্র গ্রথিত ও মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালক্রমে 'জাপানযাত্রী' রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে স্বতন্ত্র সংস্করণ পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপরিচয় -সংযুক্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থের কেবলমাত্র 'পারস্যে' অংশ মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তির উদ্‌যাপনে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপরিচয় -যুক্ত 'পারস্যযাত্রী' ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

'পারস্যে'র প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসীতে 'পারস্য-যাত্রা' নামে বাহির হয়। ২ হইতে ১১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৪০-এর বৈশাখ-সংখ্যা পর্যন্ত বিচিত্রা মাসিক পত্রে 'পারস্যভ্রমণ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় মুদ্রিত প্রথম পাঠ ও রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণের পাঠ স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে।

ভ্রমণবৃত্তান্তটির বিচিত্রায় মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত হইয়াছিল। সেই বর্জিত অংশগুলি এখানে সংকলিত হইল। সম্পূর্ণতাসাধনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশ বন্ধনীচিহ্নিত আকারে উক্ত রচনাংশের কয়েক স্থানে সংযোজিত হইয়াছে।—

৪৫৯ পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদের পূর্বে

সভারম্ভে পার্সিভাষায় কিছু বলা হলে পর আমি বললুম :

প্রকৃতিতে নিমন্ত্রণের ভার বসন্তঋতুর পরে। তার সুগন্ধ পুষ্পগুচ্ছে, পাখির গানে সেই নিমন্ত্রণ। তার আহ্বান স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে, তার বিশ্বভাষা তর্জমা করতে হয় না। কবিরা বসন্তঋতুর প্রতীক। তারা আপন দেশ আপন কালের মধ্যে থেকে সর্বদেশ সর্বকালকে আমন্ত্রণ করে।

একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌচেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের।

আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

আজ পারস্যের রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, সেই সঙ্গে সেই কবিদের আমন্ত্রণও মিলিত। আমি তাঁদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই যাঁদের কাব্যসুধা জীবনান্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েছে।

[কবির আপন ভাষায় যদি দিতে পারতুম তবেই আমার যোগ্য হত। যে ভাষা অগত্যা ব্যবহার করছি আমার ভারতী সে ভাষায় সম্পূর্ণ সায় দেন না। তাই আমি এখানে যেন ম্যুজিয়মে-সাজানো পাখি— তর্জমার আড়ষ্টতায় আমার পাখা বদ্ধ— সে পাখাবিস্তার করে মন উড়তে পারে না, সে পাখায় সজীব প্রাণের বর্ণচ্ছটাময় নৃত্য নেই।

তা হোক, মৌনের মধ্যে যে বাণী অনুচ্চারিত, বন্দনায় তারও ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই আন্তরিক বাণীর দ্বারাই পারস্যের অমর কবিদের আমি আজ অভিবাদন করি; সেই সঙ্গে পারস্যের অমর আত্মাকেও আমার নমস্কার, যে আত্মা ইতিহাসের

উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সৌন্দর্যে শৌর্যে কল্যাণে ভাবীকালের দূরদিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রে নিজেকে গৌরবান্বিত করবে।]*

আমি বলার পর ধন্যবাদ জানিয়ে ও পারস্যরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ইরানী কিছু বললেন। কৌতূহলী জনতার মধ্য দিয়ে গোধূলির আলোকে গবর্নরের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলুম।

—বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ২৯৭-২৯৮

৪৬০ পৃষ্ঠায় ২৩ ছত্রের প্রথম বাক্যটির পূর্ণতর রূপ

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম, পিতার তীর্থস্থানে আমার মানস-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

—পাণ্ডুলিপি

৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্বাবিংশ ছত্রের পরে

[এরকম ক্ষেত্রে বস্তুত ভয় ক্ষুদ্রকে— মহত্ত্বকে স্বীকার করার মতো পীড়া তাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না, বিশেষত যে মহত্ত্ব প্রথার বাঁধাপথে চিরাভ্যস্তভাবে স্বীকৃত নয়।

আমি রাজাকে জানালুম তাঁর রাজত্বে সম্প্রদায়বিরোধের হিংস্র অসভ্যতা এমন আশ্চর্য শৌর্যের সঙ্গে উন্মূলিত হয়েছে, আজকের দিনে এইটেতে আমি সকলের চেয়ে মুগ্ধ। একবার যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন, এই আকাঙ্ক্ষা আমি তাঁকে নিবেদন করলুম। তিনি বললেন, পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করতে যাবার পূর্বে নিশ্চয় তিনি যথাসম্ভব এশিয়ার পরিচয় নিয়ে যাবেন।

শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম। এ কথা সকলের মুখে শুনি, রাজা বিদ্বান নন, য়ুরোপীয় কোনো ভাষাই তাঁর জানা নেই, পারসিক ভাষা লিখতে পড়তে পারেন, কিন্তু ভালোরকম নয়। অর্থাৎ, তাঁর বুদ্ধিশক্তি বিচারশক্তি বইপড়া বিদ্যার অনেক উপরে।]

পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-উপলক্ষে উপহারস্বরূপে আমার নিজের কতকগুলি বই রেশমের আবরণে প্রস্তুত করা ছিল। সেই সঙ্গে নিজের রচিত একটি চিত্রপটে পরপৃষ্ঠায়-উদ্‌ধৃত বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জমাটি লিখে দিয়েছিলুম—

আমার হৃদয়ে অতীতস্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।

তোমরা জ্বেলেছ, নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো—
এসেছি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

I carry in my heart a golden lamp of remembrance
of an illumination that is past.
I keep it bright against the tarnishing touch of time.
Thine is a fire of a new magnanimous life.
Allow it, my brother, to kiss my lamp with its flame.

[আজ সকালবেলায় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন শীতযাপনের প্রাসাদ দেখাবার জন্যে।

তুষাররেখাঙ্কিত নীলাভ পাহাড়-ঘেরা সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলল। প্রাসাদের বাগানটি ঘনশ্যামল উচ্চশীর্ষ তরুচ্ছায়ায় রমণীয়। দু-তিন ভাগে বিভক্ত অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে প্রথম তলায় যখন উঠলুম তখন আমার নিশ্বাস বড়ো একটা বাকি ছিল না। মাথার উপরে উচ্চ গম্বুজ আগাগোড়া স্ফটিকে খচিত, আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে। ক্লান্তি গোপনের জন্যে স্থির হয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখা গেল। আরো এক তলা উপরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঠবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করে হাঁফ ছাড়লুম। প্রশস্ত বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখি, চার দিকের উদার দৃশ্য অবারিত। আকাশ নির্মল নীল, নীচের বাগানে নিবিড়নিবদ্ধ বনস্পতির ঊর্মিল বিস্তার, ডান দিকের দিগন্তে গিরিশ্রেণী, সম্মুখে দূরে তেহেরান নগরী বৃক্ষব্যূহে আবৃত। এখানে বর্তমান রাজা বাস করেন না, কেননা, এ জায়গাটা তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে। এ প্রাসাদটি প্রাচীন নয়, বছর ত্রিশ আগে তৈরি হয়েছে।]

—বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৯, পৃ. ৭৭০-৭৭১

৪৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম বাক্যের পরে

খানিকটা আমি ইংরেজিতে বলি, তার পরে তার তর্জমা হয় পারসিকে, এইরকম দু-রঙা দু-টুকরো তালি-দেওয়া আমার বক্তৃতা।

আমি যা বলেছিলেম তার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্‌ঘাটন করে প্রাণযাত্রাকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে। এই শক্তির প্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্যজাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেছি, তার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল

বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র বস্তুগত ঐশ্বর্যে মানুষের পরিত্রাণ নেই, তার প্রমাণ আজ য়ুরোপে মারমূর্তি নিয়ে দেখা দিল। পরস্পর ঈর্ষাবিদ্বেষে এবং বিজ্ঞানবাহিনী হিংস্রতার বিভীষিকায় য়ুরোপীয় সভ্যতায় আজ ভূমিকম্প লেগেছে। য়ুরোপ দেবতার অস্ত্র পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেবতার চিত্ত পায় নি। এইরকম দুর্যোগেই 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'। দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপ নিজের মৃত্যুশেল আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরি করে তুলছে।

এশিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।

পারস্যে আজ নূতন করে জাতিরচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্যে উপস্থিত, আমি আশা করে এসেছি এখানে সৃষ্টির যে সংকল্পন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণমিলনের রূপ আছে।

অতীতকালে একদা এশিয়ায় সৃষ্টির যুগ প্রবল শক্তিতে দেখা দিয়েছিল। তখন পারস্য ভারত চীন নিজ নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে একটি সম্মিলিত মহাদেশীয় সভ্যতার বিস্তার করেছিল। তখন এশিয়ায় মহতী বাণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্তির। তখন মাঝে মাঝে এশিয়ার চিত্তে যেন কোটালের বান ডেকে এসেছে, তখন তার বিদ্যার ঐশ্বর্য বহু বাধা অতিক্রম করে বহুকাল ধরে বহুদূরদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তার পর এল দুর্দিন, ঐশ্বর্যবিনিময়ের বাণিজ্যপথ ক্রমে লুপ্ত হয়ে এল। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, বিশ্বনাশা বর্বরতার নিষ্ঠুর আক্রমণে এশিয়ার মহাদেশীয় বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার পর থেকে এশিয়াকে আর মানবিক মহাদেশ বলতে পারি নে— আজ এ কেবল ভৌগোলিক মহাদেশ।

সেই প্রাচীনযুগের গৌরবকাহিনীর স্বপ্নমাত্র নিয়ে অতি দীর্ঘকাল আমাদের দীনভাবে কাটল। আজ এই মহাদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে পুনর্যৌবনের বেগ যেন আবার স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের কবিকে আজ ইরান যে আহ্বান করেছে এ একটি সুলক্ষণ; এতে প্রমাণ হয় যে, এশিয়ায় আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধ দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে দূরে বিস্তীর্ণ হচ্ছে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন

অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে। চিত্তের প্রকাশ যখন আমাদের থাকে না তখন আমরা আলোকহীন তারার মতো, অন্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ অবরুদ্ধ। চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনি মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে, আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশ মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক— তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।

আমি আপন দুর্বল দেহের অনুনয় অস্বীকার করে এই দেশে এসেছি তার সর্বপ্রধান কারণটি বক্তৃতার উপসংহারে জানিয়ে যেতে চাই। মানবিকতার দিক থেকে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পূর্বমহাদেশের আমরা স্বভাবতই তার কাছে মাথা নত করি, যান্ত্রিকতায় যা সুনিপুণ তার কাছে নয়। নিজেকে জয় করে যিনি আপন ভাগ্যের উপর জয়ী হন তাঁকেই আমরা বীর বলে স্বীকার করি। বর্তমান পারস্যরাজের চরিতকথা আমার আপন দেশের প্রান্তে বসেও শুনেছি এবং সেই সঙ্গে দেখতে পেয়েছি দূরে দিক্‌সীমায় নবপ্রভাতের সূচনা। বুঝেছি, এশিয়ার কোনোস্থানে যথার্থ একজন লোকনেতারূপে স্বজাতির ভাগ্যনেতার অভ্যুদয় হয়েছে— তিনি জানেন কী করে বর্তমান যুগের আত্মরক্ষণ-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কী করে প্রতিকূল শক্তিকে নিরস্ত করতে হবে, বিদেশ থেকে যে সর্বগ্রাসী লোভের চক্রবাত্যা নিষ্ঠুর বলে এশিয়াকে চারি দিকে আঘাত করতে উদ্যত কী করে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব। এশিয়ার যে অংশেই থাকি-না কেন এমন মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁর চরিত্র আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্পদ— বীরশক্তিতে তাঁর স্বজাতির মধ্যে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করেছেন তা দূর থেকেও আমাদের উদ্‌বোধনের সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের হয়ে, এশিয়ার হয়ে আমি তাঁকে অভিবাদন করি এবং তাঁর করস্পর্শের স্মৃতি আমার দেশে বহন করে নিয়ে যাই।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ৯-১২

৪৮৬ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদের পরে

আমার জন্মদিনে এখানকার বহুলোকের কাছ থেকে আমি যে বহু সমাদর পেয়েছি একত্রে তার উত্তর দেবার জন্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলুম। এখানকার মজলিস

ভাঙবার পূর্বে সেটা আমি সকলকে শোনালুম। ইংরেজি তর্জমা -সমেত আমার কবিতাটি এইখানে পেশ করা গেল।

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নবগৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরাহু এ মোর শ্লোক—
ইরানের জয় হোক।[১]

Iran, all the roses in thy garden
and all their lover birds
have acclaimed the birthday
of the poet of a far away shore
and mingled their voices in a pæan of rejoicing.

Iran, thy brave sons have brought
their priceless gifts of friendship
on this birthday of the poet of a far away shore,
for they have known him in their hearts as their own.

Iran, crowned with a new glory
by the honour from thy hand
this birthday of the poet of a far away shore
finds its fulfilment.

১ দ্রষ্টব্য : 'পারস্যে জন্মদিনে', পরিশেষ —রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড।

And in return I bind this wreath of my verse
on thy forehead, and cry : Victory to Iran !

বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ১৮-১৯

৪৮৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ছত্রের পরে

যতই এখানে আমার দিন শেষ হয়ে আসছে ততই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও অভ্যাগতের ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে এল। আমার অবকাশটুকু ঘিরে সপ্তরথীর শরবর্ষণ চলছে। প্রতিদিনের বিবরণ লিখে যাব দিনের মধ্যে এমন ফাঁক পাই নে। ঘটনাগুলো একটার উপর আর-একটা চাপা পড়ে পিণ্ড পাকিয়ে ভেসে চলে যায়, তাদের চেহারা মনে থাকে না। [এর মধ্যে একটি কথা স্মরণীয়। আমি মনে করেছিলুম, পারসিকের জাগরণ তাদের পলিটিক্‌সের চার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। আমি তাদের অনেককেই বলেছি, আংশিকভাবে কেবল কর্মশক্তির উদ্‌বোধনই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের চিরন্তন চিত্তশক্তি সৃষ্টিশক্তির জাগরণেই তার সম্পূর্ণ গৌরব। ইতিমধ্যে দেখলুম এখানকার আর্টস্কুলের কাজ। যিনি তার অধ্যক্ষ তিনি যথার্থ গুণী। পারসিকের স্বভাবসিদ্ধ অসামান্য কারুপ্রতিভাকে জাগিয়ে তোলবার সাধনায় তিনি নিযুক্ত, বিদেশের অনুকরণে নয়, স্বদেশের প্রেরণায়। তাঁর বিদ্যালয়ের তাঁতের কাজের যে নমুনা কয়টি তিনি আমাকে দিয়েছেন সেগুলিকে আমি বহুমূল্য বলে মনে করি।]

এখানকার যাঁরা মনীষী তাঁদের মননশক্তির স্বকীয় বিশেষত্ব এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে তার সংগতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করবার উপায় আমার নেই, কারণ এঁদের ভাষা আমি জানি নে। তার উদ্‌ভাবনা হয়তো কোথাও না কোথাও দেখা দিয়েছে, হয়তো চিন্তা ও রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে থাকবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশে যখন রামমোহন রায়ের আবির্ভাব সেই সময়ে পারস্যে বাহাই-ধর্মমত প্রাণান্তিক উৎপীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার অতি কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই ধর্ম আধুনিক যুগের সর্বজনীনতার বাণী ঘোষণা করেছে। এ কখনোই সম্ভবপর হত না যদি সম্পূর্ণভাবে এ জাতির মন সনাতনী জড়তার পাথর-চাপা মন হত। প্রাচীনকালের শাসনে রুদ্ধবুদ্ধি রুদ্ধকণ্ঠ এই দেশ বাধাবন্ধনমুক্ত হয়ে চিত্তসম্পদশালী হয়ে উঠবে তার লক্ষণ চারি দিকে যেন অনুভব করতে পারছি। আজ দশ বৎসরের মধ্যে পারস্য অচলপ্রথার অন্ধতা থেকে যে এতদূর মুক্তিলাভ করেছে এবং নূতন যুগের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্যে এতটা দূর তার আধুনিক অধ্যবসায়, তার কারণ তার মন স্বভাবতই মননশীল— পারস্যের ইতিহাসে পূর্বেও তার প্রমাণ হয়েছে। অধ্যাপক ব্রাউন বলেছেন,

জরথুস্ত্র এবং বাহাইমত-প্রবর্তক বাবের মাঝখানে অন্তত ২৫ শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যকালের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য যে-পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে তার থেকে দেখা যায়, এই সদাসচেষ্ট অবিরামমননশীল পারসিক চিত্ত মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সার্থকতার মহাসমস্যা ভেদ করবার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করেছে।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ২০-২১

৪৮৮ পৃষ্ঠার উনবিংশ ছত্রের পরে : অষ্টম অধ্যায়ের শেষ

আর-একটি মানুষের চেহারায় পারস্যের আর-একটি প্রবল রূপ আমার মনে অঙ্কিত হয়ে গেছে। ইনি রাজার সভামন্ত্রী তেমুর্তাশ। আধুনিক কাল বিষম জোরের সঙ্গে এশিয়ার দ্বারে ধাক্কা মেরেছে, এই মানুষ তেমনি জোরের সঙ্গেই তাকে দিয়েছেন সাড়া। দৈবনির্ভরের সাধু বিশেষণধারী নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে পুরুষকারের আত্মপ্রভাব -প্রচারের ভার নিয়েছেন ইনি।

ইনি জানেন, বহুকাল থেকে শাস্ত্র ও লোকাচারের মোহে মূর্ছিত আমাদের প্রাচ্যদেশ। মানুষের বুদ্ধি ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে অশ্রদ্ধা করে খর্ব করে রেখেছে, সেইজন্যেই চার দিক থেকেই আমাদের এমন পরাভব, এত অপমান। উজ্জ্বল এঁর মুখশ্রী, বলিষ্ঠ এঁর বাহু, অপ্রতিহত এঁর উদ্যম। দেখে আনন্দ হয়; বুঝতে পারি, পারস্যকে তার আত্মগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করবার দীপ্যমান ধীশক্তি এঁর। অন্তরের মূঢ়তা বাহিরের শত্রুর সর্বপ্রধান সহায়। তাই আজ যাঁরা পারস্যের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁদের সতর্কতা দু দিক থেকেই উদ্যত। হালের মাঝি বাহিরের ঢেউয়ের উপর ঝিঁকে মারছে, আবার সংস্কারকর্তা লেগে আছে খোলের ছিদ্র মেরামতের কাজে। যাঁরা সব চেয়ে দুর্জয় আত্মরিপুকে বশে আনবার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন এই তেমুর্তাশ। সেদিন তিনি আমাকে সগর্বে বললেন, 'পারস্যের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করবার ভার নিয়েছি আমরা, অর্থাৎ ভূতকালের আঁচল-ধরা হয়ে আমরা ঝিমিয়ে থাকতে চাই নে।' আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ভূতের পা উলটোদিকে। আজ এশিয়ার পিছন-ফেরা পা আজও যাদের উলটো পথ নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্ছি আমরা। জাগ্রতবুদ্ধি অবিচলিতসংকল্প এই তেজস্বী পুরুষকে দেখে মনে মনে এঁকে নমস্কার করেছি; বলেছি, তোমাদের মতো মানুষের জন্যেই ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে আছে, কেননা চিত্তের স্বাধীনতাই ন্যাশনাল স্বাধীনতার বাহন।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল। আজ এখানকার রাজসরকার আমাকে জানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে তারা পারসিক বিদ্যার আসন প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই সুযোগে তাঁদের এই অতিথিকে উপলক্ষ করে পারস্যের সঙ্গে ভারতের

যোগস্থাপন হবে।

প্রধান মন্ত্রীবর্গ আজ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ২১-২২

১৩৩৯ ভাদ্র ও চৈত্র -সংখ্যা বিচিত্রায় নানা-বক্তৃতাদির রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে সেগুলি সংকলিত হইল।—

বুশেয়ারের সর্বসাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্নর -কর্তৃক অভিনন্দন

আজ যে শ্রদ্ধেয় অতিথিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ আমাদের ঘটেছে, এঁর মোহিনীশক্তি অগ্রদূত হয়ে এসে কিছুকাল ধরে আমাদের অধীর আগ্রহান্বিত প্রতীক্ষাকে হর্ষোজ্জ্বল করে রেখেছিল। এঁকে পৃথিবীর সকল জাতি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; যেখানেই মনের উৎকর্ষ আছে, বিদ্যা আছে, সেখানেই এঁর গ্রন্থাবলী যে সমাদর লাভ করেছে, জনে জনে ইনি বিতরণ করেছেন যে প্রেমের ও সমবেদনার বাণী, তাই থেকেই এঁর গুণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যাকাশে ইনি উজ্জ্বলতম তারকারাজির অন্যতম; মানুষের চিন্তার মধ্যে ইনি সঞ্চারিত করেছেন যে কল্যাণের শক্তি তা যেমনি পবিত্র তেমনি নিষ্কলঙ্ক।

ইন্দো-ইরান বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ডক্টর ঠাকুর আদর্শস্থানীয়, প্রাচ্য মনীষার মধ্যে যা-কিছু সুন্দর ও মহীয়ান তারই প্রাণবান প্রতীক। তাঁর বাণীর ঐশী শক্তি পাশ্চাত্য চিন্তা ও তথাকথিত সভ্যতাকে স্বীকার করিয়েছে যে বর্তমান যুগের এই জড়-চৈতন্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বের মীমাংসনে প্রাচ্যের কিছু দেবার আছে, কিছু ক্ষমতা আছে। মনুষ্যত্বের প্রগতিতে তাঁর রচনা ছন্দোরক্ষার সহায়তা করে, কারণ, আজ আমাদের পশ্চিমের ভ্রাতারা যে জড়রূপের মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তার ফলে চরিত্রবিকৃতির যে আশঙ্কা ঘটছে, সেই আশঙ্কা দূর করবার জন্য জড়ের মধ্যে এই ঐকান্তিক অভিনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন।

ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্যপরিদর্শন যেমনি সন্তোষের বিষয় তেমনি গুরুফলপ্রসূ—কেননা, এতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে পারস্যের বুদ্ধিগত কৃতিত্বের প্রতি উদার ভারতীয়দের কৌতূহল কতখানি, আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ও সাহিত্যকে তারা কতখানি সমাদর করে। এই শ্রদ্ধেয় সাধু আজ আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধলেন, কেননা অল্পদিনের জন্যে হলেও এমন একজন মহাপুরুষের দীপ্তির কাছাকাছি আসার

সৌভাগ্যটা সাধারণ লোকে যতখানি ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের কবি সাদি এক জায়গায় বলেছেন—

হায় মানুষ! এই জগৎটা শুধু দৈহিক অহং'এর পুষ্টির জন্য নয়;
যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়োই কঠিন;
ভোরের পাখির সুরলহরী নিদ্রিত মানুষ জানে না;
মানুষের জগৎটা যে কী তা পশু কেমন করে জানবে।

তেমনি সাধারণ লোকে না বুঝলেও এটা সত্য যে, ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্যে আগমন সেই ভারতীয় জাতিরই মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন যে জাতি একটি অপরূপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন জাতিই তার অতীত গৌরব আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ নিয়ে ন্যায়ত দাবি করতে পারে যে, মানুষের চিন্তাকাশে অত্যুজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে অনেকগুলি তারই, আর জগৎকে সে এক অতি গভীর দর্শনশাস্ত্র দান করেছে।

নীতিতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক দিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকে এ দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। সাসানীয় যুগের প্রাচীনতম সাহিত্যের যে-সব পুঁথি আজ প্রচলিত আছে তার মধ্যেও পাওয়া যায় এই দুই জাতির পরস্পর আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের কথা। দেখা যায়, আজকের যুগের মতো প্রাচীন পারস্যবাসীরাও ভারতবর্ষকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত, গভীর চিন্তা ও নিগূঢ় তত্ত্বরাজির দেশ হিসেবে। প্রথম সাসানীয় সম্রাট অর্দশির বাবেকানের কার্নামেতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি তাঁর রাজ্যসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চান তখন কোনো ভারতীয় সম্রাটের নিকট তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। ফারদৌসীর শা'নামেতেও এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইরানে ইসলামধর্মের প্রসার ও ভারতে তার প্রভাববিস্তৃতির পর থেকে ভারত-পারস্যের এই মিলনসূত্র পরিবর্তনপরম্পরার ভিতর দিয়ে নব নব তেজে দৃঢ়ীভূত হয়েছে— এবং আশা করা যায়, এর পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হবে।

এইখানে আমাদের অতিথির অবগতির জন্য বলাটা প্রাসঙ্গিক হবে— বর্তমান মহারাজের নিকট পারস্যজাতি কতখানি ঋণী। চিরসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিশৃঙ্খলের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন; অক্লান্ত উদ্যম ও অত্যাশ্চর্য গঠনশক্তির দ্বারা তিনি এখানে এমন একটা শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সর্ববিষয়েই তাঁর উন্নতিশীল প্রজাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। চতুর্দিক যখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দেশ যখন সর্বনাশের প্রান্তে এসে টলমল করছে, তখন যেন তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন স্বর্গ

থেকে আদেশ নিয়ে এসে; এবং প্রকৃত দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন যে অনেকেরই মনে হয়েছিল, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। শিক্ষা ও মানসিক সংস্কারের ব্যবস্থা এতদিন অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এখন আবার সে-সব মহারাজের উৎসাহ পাচ্ছে। আধুনিক প্রণালীতে অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা তো হয়েছেই, তা ছাড়া নিয়মিতভাবে যোগ্যতম ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছে টেক্‌নিকাল শিক্ষালাভের জন্য।

আমাদের কবি ও ঋষিদের স্মৃতি এতদিন তাঁদের ভক্তদের প্রাণের মধ্যেই বাসা বেঁধে ছিল; এখন সেই স্মৃতিকে বহির্জগতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা শুভ লক্ষণ; এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের অতীত গৌরবের চেতনা জাতির প্রাণের মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত পারস্যবাসী ও বিদেশী পারস্যবন্ধুদের মনে আশা হয়েছে যে, এই অদ্বিতীয় সম্রাটের সুদক্ষ নেতৃত্বে পারস্যদেশ আবার জগতের কল্যাণসাধনের শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

আশা করি, ডক্টর ঠাকুরকে এই-যে আমাদের প্রাণভরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম, এর জন্য তাঁর স্পর্শভীরু স্বভাবে কিছু আঘাত লাগলেও তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। যদিও জানি 'অলংকারবিহীন সৌন্দর্যই সুন্দরতম অলংকার' তবুও তাঁর প্রতি আমাদের যে ভক্তি তা একটু নিবেদন না করে পারলাম না।

আমাদের ভরসা আছে, ডক্টর ঠাকুর তাঁর এই ভ্রমণে আনন্দ পাবেন, এবং সত্যকারের শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরুর প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা পারস্যে তার কোথাও কোনো অভাবই হবে না।

কবির উত্তর

পারস্যের ভ্রাতৃগণ,

আমার সম্বন্ধে আপনাদের অনুগ্রহবাণীর জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে আসাটা আমার জীবনে একটা বড়ো সুযোগ, এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি। এই প্রথম নিবিড়ভাবে পারস্যের স্পর্শ অনুভব করা গেল। আর যে-কদিন আপনাদের দেশে থাকব তার মধ্যেই পারস্যবাসীদের সঙ্গে আরো গভীরতর পরিচয়-সাধনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

আমি কবি— আমি সেই কবিসংঘের একজন যাঁদের বাণী মনুষ্যত্বের অন্তরে পৌঁছনোর পথ খুঁজে নেয় কোলাহলময় বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নয়, অনন্তের আলয় যে গভীর স্তব্ধতা তারই মধ্য দিয়ে। প্রচার করা বা শিক্ষা দেওয়া আমার কাজ নয়— আমি আছি প্রাণের আহ্বানে সাড়া দেবার কাজে, অনুভূতির ভাষায়, সৌন্দর্যের ভাষায়।

কবিযশের কোনো দাবি যদি আমার থাকে তবে তার উদ্‌ভব হল সেই মৌন নিঃসীমতায় যেখান দিয়ে মানবহৃদয়ের মহাদেশে অনুপ্রেরণা ও ভাবস্পন্দনের প্রাণময় আদান-প্রদান চলতে থাকে।

শৈশব থেকেই আমি মানুষ হয়েছি নির্জনতার আবহাওয়ায়, প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে। তার থেকে অনুপ্রেরণা যত পেয়েছি, আমার স্বপ্নে ও কল্পসৃষ্টিতে প্রতিদানও দিয়েছি তেমনি। নিয়তির দুর্বোধ্যলীলায় এই নিঃসঙ্গ কবিকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এশিয়া ও পশ্চিমমহাদেশের বড়ো বড়ো দেশগুলিতে সহস্র লোকচক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টির মাঝখানে। তথাপি সে-সব জায়গায় যে-সকল বাণী ও যে-সমস্ত অভিভাষণ আমাকে দিতে হয়েছিল আমার সত্যিকারের ভাষা সেখানকার নয়, সে আছে আমার সৃষ্টিনিরত আত্মার গভীরে— যেখানে আমার চিন্তারাজি বাক্য হারিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে সেইখানে।

যদি আজ আপনাদের দেশে না আসতাম তবে আমার তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আজ আপনাদের দেখা পেয়ে নির্মল আনন্দে আমার জীবনের এই সন্ধ্যা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যে প্রেমসূত্রের নিদর্শন আজকের এই সভা, সেই প্রেমসূত্রে প্রাচ্যের এই দুটি প্রাচীন সভ্যতাকে মিলিত করতে পেরে আজ আমি ধন্য।

কবির সংবর্ধনা-ভোজের অন্তে বুশেয়ারের গবর্নরের বক্তৃতা

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্যাকাশের উজ্জ্বলতম তারা; তাঁর মনীষার দীপ্তি শুধু এশিয়া মহাদেশকে নয়, সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেছে। আজ যে তিনি পারস্যদেশে পদার্পণ করেছেন, এতে আমাদের দেশ গৌরবান্বিত হল।

পুরাকালে ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল; ধর্ম শিল্প এবং আরো অনেক উপায় অবলম্বন করে তারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই নিবিড় আত্মীয়তায় দুটি দেশেরই প্রচুর লাভ; সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই মহাপুরুষের আমাদের দেশে পদার্পণ। আজ তাঁর আগমনে সমস্ত ইরানদেশে একটা সাড়া পড়ে গেছে; আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি, তাঁর এই ভ্রমণে যেন তিনি আনন্দলাভ করেন, আমাদের মধ্যে যা-কিছু সত্য, যা-কিছু ভালো আছে, আমাদের দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান -কালে তাই দিয়ে যেন আমরা তাঁকে খুশি করতে পারি।

কবির উত্তর

চিন্তাসমৃদ্ধ এই প্রাচীন দেশের প্রতি আমি চিরকালই অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি; এই দেশ দেখা এবং এ দেশের অধিবাসীদের পরিচয় লাভ করাটা আমার

অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বাংলাদেশের কবি আমি আজ ইরানদেশে এসেছি, প্রাণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে। দুঃখ এই, আমার এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারব না, প্রাণ ভরে এখানকার জীবনযাত্রার নিকটসংস্পর্শে আসতে পারব না। তবুও এটা বলতে পারি যে, এখান থেকে আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা ও শাশ্বত মূল্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব। পারস্যে এসে আপনাদের নিকট যে বিরাট অভ্যর্থনা পেলুম এর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

— বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ১৫৬-১৬০

১৫ এপ্রিল [১৯৩২] তারিখে কবি-কর্তৃক পারস্যসম্রাট রেজা শা পহ্লবীর
নিকট প্রেরিত তারের মর্মানুবাদ

মহারাজ,

যে উদার আতিথেয়তা আপনার নিকট পেলেম তার জন্যে ইরান থেকে বিদায় নেবার আগে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে নিবেদন করি। আপনি আপনার নিজস্ব প্রাণশক্তি দেশের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য রেখে যাই। আপনার প্রজাবর্গের প্রতি আমার অন্তরের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি কথা বলে আজ বিদায় গ্রহণ করব।

ইরানের বন্ধুবর্গের প্রতি

আজ শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছে বিদায় নেবার সময় এসেছে ; কৃতজ্ঞতায় ভরা আমার এই হৃদয়খানি তোমাদের দেশে রেখে গেলেম। তোমাদের সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে যে সম্মান দিয়েছেন তোমরা রাজভক্ত প্রজার মতো সেই সম্মানের মর্যাদা রেখেছ এবং তোমাদের চিরাচরিত আতিথেয়তার ইতিহাসবিশ্রুত যশ অম্লান রেখেছ। তোমাদের এই উদার অভ্যর্থনা আমি গ্রহণ করেছি অন্তরের সঙ্গে, বিশেষত যখন এর মধ্যে রয়েছে আমার মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিক-শ্রদ্ধা-নিবেদন। যে দুটি জাতির মহাস্থান আজ ভারতবর্ষ ও পারস্য, ইতিহাসের প্রথম যুগে তারা যখন অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে তাদের জয়যাত্রা শুরু করেছিল তখন তারা ছিল এক। কালচক্রে তারা পৃথক হয়ে গড়ে তুলল এশিয়ার দুটি বিরাট সভ্যতা, তার মধ্যে প্রকাশের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হলেও অন্তরের তেজ ও প্রাণশক্তি একই রকম। যুগে যুগে তাদের মধ্যে চিন্তাসমৃদ্ধ চিত্তের

আদানপ্রদান চলে এসেছে, যতদিন-না এশিয়া তন্দ্রাবেশে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল।

অবশেষে দেখা গেল নবজাগরণের আলোকরশ্মি। এই মহাদেশের অন্তরের মধ্যে একটা স্পন্দমান জীবনের কম্পন ক্রমেই যেন নিবিড় আত্মোপলব্ধির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই পুণ্য মুহূর্তে আজ আমি কবি তোমাদের কাছে এসেছি নবযুগের শুভ্রপ্রভাত ঘোষণা করতে, তোমাদের দিগন্তের অন্ধকার ভেদ করে যে আলোক ফুটে উঠেছে সেই আলোককে অভিনন্দন করতে— আমার জীবনের মহৎ সৌভাগ্য, আজ তোমাদের কাছে এলেম।

জয় হোক ইরানের!

ইরান-সম্রাট রেজা শা পহ্লবী দীর্ঘজীবী হোন!

পারস্য-সম্রাটের উত্তর

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমরা আপনার টেলিগ্রাম দেখেছি। আপনি পারস্য-প্রবাসে তৃপ্ত হয়েছেন এতে আমরা সুখী হয়েছি। আপনার এই প্রতিবেশী দেশটিতে যদি আরো কিছুকাল থাকতে পারতেন তো আরো খুশি হতেম এবং প্রাচ্যের প্রতি আপনার অন্তরের প্রীতি আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেয়ে আরো উপকৃত হতেম। আপনি আমাদের সম্বন্ধে যে সাধুবাদ করেছেন তা আমরা কখনো ভুলব না।

রেজা শা

বোগদাদ ম্যুনিসিপালিটি-কর্তৃক ম্যুনিসিপাল-উদ্যানে কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা

ইরাক-সম্রাটের সাদর নিমন্ত্রণে আজ যে আমি ইরাকের প্রাচীন ও বিরাট সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেলেম সেজন্য সম্রাটকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আজ যখন এই প্রাচীন জাতি নবজন্ম লাভ করছে, যখন সৃষ্টির একটা অদম্য বেগ এর চিত্তকে সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের গরিমা ও মুক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে পরিণত করে তুলছে, তখন এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার জীবনের সত্যই একটা বড়ো অনুপ্রেরণার বিষয়। এখানকার বাতাসে আমি অনুভব করছি যৌবনের সেই উদ্দীপনা যা সমস্ত এশিয়া মহাদেশকে আজ নবযুগের নূতন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যাকুল করে তুলছে।

আপনারা জানেন দুর্ভাগ্যবশত বয়স এবং স্বাস্থ্য দূরত্বের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে বাধা দেয়; তাই আপনাদের এই সাদর অভ্যর্থনায় পরিবর্তে আপনারা আমার কাছে যতখানি আশা করেন হয়তো তার সবটুকু সফল করে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শুনলেম, আজকের দিনে আমাকে এই নিমন্ত্রণ প্রধানত বোগদাদের সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। আমি যে দলের লোক বলে গৌরব অনুভব করি আমাকে সর্বসাধারণে তাঁরাই যে প্রথমে অভিনন্দন করবেন এটা স্বাভাবিক। আজ হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ বোধ করছি এই ভেবে যে, আমার কিছু কিছু রচনা আপনাদের ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আপনাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছে। সেই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমি আগেই আপনাদের নিকট পরিচিত হয়েছি। এতে নূতন করে এই প্রমাণ হয় যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতির প্রভেদ নেই, আমাদের ভাবরাজি অবাধে মেলামেশা করে পরস্পরের সহযোগিতায় এমন একটা পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে যার মধ্যে চিরন্তন মানবের কল্যাণ নিহিত আছে।

ইতিহাস মানুষের প্রতি বিশেষ সদয় হয় নি। প্রবল জাতির লোলুপতা দুর্বল জাতিকে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে; অন্যায়ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য দুর্বল জাতিকে শোষণ করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাই আজ মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সন্দেহে, দুঃখে, যন্ত্রণা-জর্জরিত। অসামঞ্জস্যের গ্লানি আমাদের জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পরস্পরের এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের বেদনা থেকে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাকে উচ্চতর সুরে বেঁধে তোলা— সে তো আমাদেরই কাজ – আমরা যারা সাহিত্যের মন্দিরে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি। আমরা যে দেশেরই সন্তান হই-না কেন আমাদের জীবনের এই এক উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রীস্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাঁথতে হবে। মানবজাতিকে আত্মঘাতী সংগ্রাম ও উন্মত্ত কুসংস্কারের বর্বরতা থেকে রক্ষা করবে এই মিলনের উপনিবেশ। নূতন যুগের সূচনা করব আমরা— শুভবুদ্ধির যুগ, সহযোগিতার যুগ, যার মধ্যে ভাবের পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিপুল ঐশ্বর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ, প্রাণের মধ্যে এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝখানে এসেছি। আমার প্রাণের এই গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ করে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেছি। আমার আহ্বান এই— আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক

দ্বন্দ্ববিদ্বেষের মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি। ইতিহাসের গৌরবের যুগে আপনাদের আরবসভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল; আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় করে আমার দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।

মানুষের মধ্যে যা-কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই, আপনাদের মহানুভব ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করি— মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য নির্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা, তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আজ আপনাদের কবিদের আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তিলাভের পথ।

বন্ধুগণ, আজ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অভাব মোচন করাতেই জাতীয় আত্মপ্রকাশের সকল দায়িত্ব শেষ হয় না— দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে আপনাদের বাণী পৌঁছনো চাই সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের নৈতিক সমস্যাগুলি আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রয়োজন হলে দ্বিধা না করেই সত্যবাক্য শোনাতে হবে। আজ সেই মহাপ্রয়োজন সমাগত। আপনাদের সমধর্মী ভারতবাসীরা আজ প্রতীক্ষা করে আছে আপনাদের কাছে থেকেই নূতন বাণী শুনবে, বীর্যের বাণী, মিলনের বাণী, সকল ধর্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী।

—বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৯, পৃ. ৩০২-৩০৭

প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে 'প্রদোষ' শব্দের যে প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন,

পত্রিকায় রচনাটি প্রথম-প্রকাশ-কালে তাহা লইয়া তৎকালীন সাময়িক পত্রে বিতর্ক উপস্থিত হয়। সেই প্রসঙ্গে বিচিত্রার পরিচালক সুশীলচন্দ্র মিত্রকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হইল—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখায় 'প্রদোষ' শব্দের প্রয়োগে অর্থের ভুল ঘটেছে, সেই নিন্দাক্ষালনের জন্য তোমার পত্রিকায় কিছু প্রয়াস দেখা গেল। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে জেনেই আমি বলছি, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অজ্ঞতা ও অনবধানতায়, স্বকৃত ও অন্যকৃত দোষে, অনেক ভুল আমার লেখায় থেকে গেছে। মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত হই নে। পাণ্ডিত্যের অভাব এবং অন্য অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও সমাদরের যোগ্য যদি কোনো গুণ আমার রচনায় উদ্‌বৃত্ত থাকে তবে সেইটের 'পরেই আমার একমাত্র ভরসা, নির্ভুলতার 'পরে নয়।

রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ওই শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলাভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এইরকম স্থির করেছি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সঙ্গম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চলবে না।

আমার লেখায় এর চেয়ে গুরুতর ভুল, ইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ছে এমন ছেলে চিঠি লিখে একবার আমাকে জানিয়েছিল। আমি মিথ্যা তর্ক করি নি, তাকে সাধুবাদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। অপবাদের ভাষা ও ভঙ্গি -অনুসারে কোনো কোনো স্থলে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু না করা ক্ষুদ্রতা। আমি পণ্ডিত নই, শোনা কথা বলছি— কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় বলেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জনাও হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল, কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল

তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েছে। সাহিত্যে চিত্রকলায় এই গল্পটির প্রয়োগ খাটে। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩২।

—বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ১৬১

বিচিত্রায় উক্ত পত্র পাঠ করিয়া শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন, প্রত্যুষ (বা প্রত্যূষ) শব্দযোগেই 'রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষ'কে নির্দেশ করা যায়। প্রত্যুত্তরে কবি তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল—

প্রদোষ শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তুমি আমার বক্তব্যটি ঠিক হয়তো বোঝো নি।

প্রত্যূষ শব্দটি কালব্যঞ্জক— অর্থাৎ, দিনরাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যুষ। বাংলাভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো-অন্ধকারের সমবায়ের যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায় সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করি। ইতি ২৩ অগস্ট ১৯৩২।

—বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ৪২৯

কবির পারস্যভ্রমণের অন্যতম সহযাত্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'পারস্য-ভ্রমণ' (প্রবাসী। শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৯) ও 'প্রত্যাবর্তন' (প্রবাসী। বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৪০) নামে প্রবাসী মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' নামে ৭ পৌষ ১৮৮৪ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পারস্যে' প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধগুলি প্রণিধানযোগ্য।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সংশোধন

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ও সাময়িক পত্র দৃষ্টে বর্তমান মুদ্রণে কৃত সংশোধন।

কবিতা	পৃষ্ঠা	ছত্র	
তীর্থযাত্রিণী	৪২	১০	'অর্ঘ্যেরে' স্থলে 'অর্থেরে'
নতুন কাল	৪৫	৩৭	'কিংবা' স্থলে 'কিম্বা'

স্বতন্ত্র সেঁজুতি গ্রন্থে বৈশাখ ১৩৭৭ সংস্করণে সংশোধিত।